Unmesh

November '21

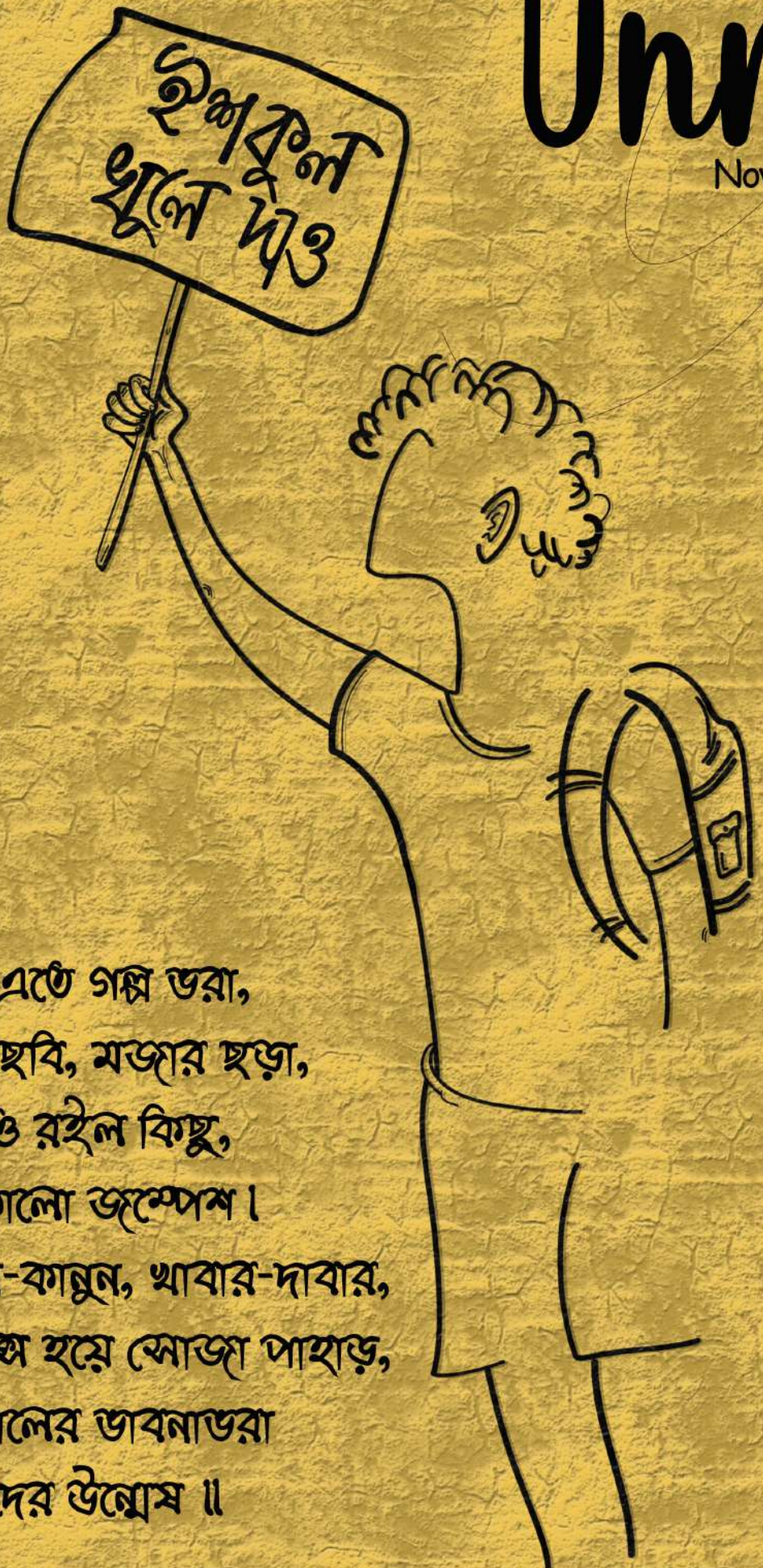

রইল এতে গল্প ভরা,
রঙিন ছবি, মজার ছড়া,
প্রবন্ধও রইল কিছু,
জমকালো জম্পেশ।
আইন-কানুন, খাবার-দাবার,
ফিজিক্স হয়ে সোজা পাহাড়,
২১ সালের ভাবনাভরা
আমাদের উন্মেষ ॥

RAMAKRISHNA MISSION

UNMESH

A Manifestation of Creativity

An effort by
the students of
The Department of Physics
School of Mathematical Sciences
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute
(Declared by Govt. of India as deemed university under section 3 of UGC Act, 1956)
Belur Math, Howrah

November 2021
Fourth Edition

Unmesh

Published by
Department of Physics,
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute
(Declared by Govt. of India as deemed university under section 3 of UGC Act, 1956)
P.O.: Belur Math, Dist: Howrah, PIN: 711202, West Bengal, India
Phone: (033) 2654-9999
e-mail: phy.rkmvu@gmail.com, rkmveri@gmail.com
Website: http://physics.rkmvu.ac.in/

First edition: September 2016
Second Edition: April 2017
Third Edition: September 2017
Fourth Edition: November 2021

About the Magazine:

With an attempt to look beyond the customary monochromatic schedule of classes, lab-work, projects and assignments, the students of the Department of Physics re-invent themselves in the form of a magazine in which they embark upon a journey through the lanes of memories, the thorns of reality, and the stream of dreams.

The magazine, named Unmesh, is an opportunity for the students to express themselves in poems, stories, articles, paintings, and photographs, and is truly a magazine by the student, for the student, and of the student: it is the students who do everything: planning, designing, editing, typing, with full support from the department and the University.

সম্পাদকমন্ডলী

সম্পাদক

দিশা বন্দ্যোপাধ্যায়
disha080203@gmail.com

শালিনী মাজি
shalinimaji@gmail.com

শ্রেয়সী পাল
spaul00009@gmail.com

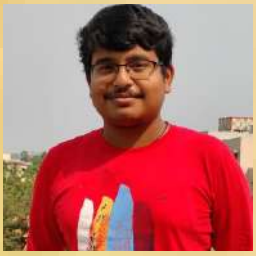

সৌম্যজিৎ বোস
bosesoumya741156@gmail.com

সৌমিত রায়
soumitosis@gmail.com

ই-পত্রিকা সম্পাদনা

সৌমিত রায়
soumitosis@gmail.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও উৎসাহ প্রদানে

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের
সম্মানীয় শিক্ষকবৃন্দ

প্রচ্ছদ অলংকরণ

ঋক্ ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
rwiku98@gmail.com

"যত মত তত পথ।"
-শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

"যদি শান্তি চাও, কারোর দোষ দেখোনা, দোষ দেখবে নিজের।"
-শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী

"আমি বিশ্বাস করি যে, কেউ কিছু পাওয়ার উপযুক্ত হলে জগতের কোনো শক্তিই তাকে বঞ্চিত করতে পারেনা।"
-স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদকীয়

বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়েই চলছে এক ঘোর অমানিশা। করোনার করাল গ্রাসে প্রকৃতি থেকে মানুষ সকলেই বিপর্যস্ত। আমাদের চেনা পরিবেশ যেন খুব দ্রুত অচেনা হয়ে যেতে শুরু করেছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে চলছে এক উত্থান-পতনের খেলা। আমরা সকলেই এই টানাপোড়েন, এই খেলার সজীব অণু-পরমাণু বা সমান অংশীদার। চারদিকে যেন যুগ পরিবর্তনের হাওয়া। আর এই পরিবর্তনের হাওয়ার উদ্দাম বেগ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, তছনছ করে দিতে চাইছে আমাদের সামাজিক বন্ধন, মানসিক স্থিতি ও পরিবেশ। ফলে এক ঘোর অন্ধকার নেমে আসছে সমাজে। একা হয়ে যাচ্ছি আমরা। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে তাই আমরা খুঁজছি নিজেকে, নতুন করে বুঝতে চাইছি নিজের অস্তিত্বকে, জানতে চাইছি আমাদের অন্তরের অন্তরতম স্পন্দনকে। এই জানবার, খুঁজবার, বুঝবার প্রয়াসই হল আমাদের পত্রিকা '**উন্মেষ**'।

প্রায় চার বছর পরে আবার নতুন কলেবরে, নতুন ভাবনায়, নতুন চেতনায় হাজির হতে চলেছে আমাদের এই পত্রিকা। ২০২১ সালে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ভয়াবহতার মাঝেও যেভাবে আমাদের শিক্ষকবৃন্দ এবং সহপাঠীরা আন্তর্জালিক মাধ্যমের মধ্যে দিয়েই এই পত্রিকা গঠন এবং প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, তা সত্যিই অনস্বীকার্য। তাদের মধ্যে যাদের কথা না বললেই নয়, আমাদের বিভাগীয় প্রধান অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, যার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উৎসাহে আমাদের পত্রিকা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে এবং আমাদের সহপাঠী ও সহকারী সম্পাদক সৌমিত রায়, যার নিরলস পরিশ্রম এবং দক্ষ কর্মনিপুণতা এই পত্রিকাকে পূর্ণতা দিয়েছে। আশা রাখছি, এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ এই কঠিন সময়ে সকলের মননে নতুন ঊষার **উন্মেষ** ঘটাবে।

"The spiritual impact that has come to Belur [Math] will last fifteen hundred years, and it will be a great University. Do not think I imagine it; I see it." **-Swami Vivekananda**

আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূরক হিসেবে যে বিজ্ঞান, ধর্ম এবং আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সমন্বয় প্রয়োজন, স্বামীজির এই উপলব্ধির বাস্তব রূপায়ণই হল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute। আশা করি, আমরা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হব।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা

1 *Religion for the scientific mind: Swami Vivekananda on Vedanta* — *Br. Aditya*

6 *Thank You Dreams* — *Krishna Tewary*

6 দুনিয়ার মেয়েরা এক হও — শালিনী মাজি

7 লুচির সাতকাহন — সৌমিত্র রায়

9 সঙ্গী — সায়ন্তন বিশ্বাস

10 বিন্দুভাবনা — সৌভিক ভট্টাচার্য্য

11 গোমুখের পথে — অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

12 দেশলাই — দেবোদ্যুতা রায়

13 মা — বৃষ্ণা তেওয়ারী

15 *Chaotic Inspiration* — *Sutirtha Paul*

পৃষ্ঠা সংখ্যা

18 গায়ের রং — রাজেশ জানা

18 অনির্বাণ — ভাস্কর মন্ডল

19 নিসঙ্গী — সুবীর মান্না

20 *Days* — *Mariom Mamtaj*

21 মজার ছলে — শ্রেয়া দেবনাথ

22 খুকুর দুপুর — শালিনী মাজি

23 *Before Sunrise- A lover's Dream* — *Subhajit Kala*

24 *Physics* — সোনাক্ষী সাহা

25 ভাইরাস!! যার কোনো ভ্যাকসিন নেই — সৌম্যজিৎ বোস

26 ২০-২১ এর ক্লাসঘর — মৌলি সাহা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা

27 কোচবিহারের রাসমেলা
শ্রেয়সী পাল

29 রামানুজনের আশ্চর্য গণিত ভাবনা
রাহুল রায়

31 বাবা-ছেলের যে সংলাপ হওয়া উচিৎ হয়নি
অর্কপ্রভ শীল

32 The World Thorugh the Eyes of a Corona Virus
Mariom Mamtaj

33 গড়িয়াহাট সংহতি ইশকুল
ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

36 অশনি সংকেত
তন্ময় আচার্য্য

37 'চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউসমেন্ট' একটি অবহেলিত অপরাধ
শালিনী মাজি

39 The Summer Capital of British India - Shimla
Disha Banerjee

41 সভ্যতার ইতিবৃত্ত
সায়ন্তন বিশ্বাস

42 স্বপ্নপূরণ
দেবাদৃতা রায়

পৃষ্ঠা সংখ্যা

43 Football in La Catedral
Sreyan Bhowmick

44 Where beauty lies.
Avipsa Chakrabarti

চিত্রসূচী

পৃষ্ঠা সংখ্যা

45 Our respected Teachers by Kamakhya Narayan Dutta

47 by Arnab Bhowal and Sayantan Biswas

48 by Sreya Chatterjee and Madhusri Roy Chowdhury

49 by Rwik Dharmapal Banerjee

50 by Disha Banerjee

51 by Krittika Adhikari

53 by Towasum Mondal

পৃষ্ঠা সংখ্যা

55 Two Paths Towards.. by Sayan K. Pal

56 by Krittika Adhikari

57 by Saibal Misra

58 by Subir Manna

59 by Amitava Bhattacharya

61 by Soumit Roy

63 by Sujay Mondal

চিত্রসূচী

পৃষ্ঠা সংখ্যা

65 by Krishna Tewary

67 by Mariom Mamtaj

69 by Shreya Debnath

71 by Arka Bhattacharyya

73 Beauty of North Bengal
by Shreyashi Paul

75 Himachal: Land of Snow-capped Mountains
by Disha Banerjee

77 Birds of Rabindra Sarobor
by Rwik Dharmapal Banerjee

অন্যান্য

পৃষ্ঠা সংখ্যা

81 Crossword
(Physics Related)

82 Word Search
(Physics Related)

83 Down The Memory Lane

Religion for the scientific mind: Swami Vivekananda on Vedanta

Br. Aditya
Monastic Faculty,
Department of Physics, RKMVERI

Religion and Science are two forces that have had tremendous influence on the history of mankind. While many members of today's scientific community may not be seriously concerned about religion/spirituality and vice versa, it is evident that that no human pursuit, whether scientific or spiritual, operates in a vacuum. The great diversity in the nature and capacity of human beings has made us invent several avenues for seeking satisfaction and fulfilment – science, philosophy, religion, business, economics, politics, arts, and sports, to name a few. Given that most people have some interest in more than one of these, and given that human progress in any one pursuit (e.g. science) often requires the contribution of serious practitioners of other pursuits (tax-payers, politicians, etc.), it is inevitable that human progress in each avenue is entangled with all the others. It is sometimes argued that two of these pursuits -- science and religion -- are *opposed* to each other, and cannot (or even *should not*) tolerate each other. Since both of these appear likely to retain their strong influence on the human society in the foreseeable future, how they interact with each other may well determine the future course of humanity.

In this article, we shall explore the relation between science and religion and examine whether there is any inherent incompatibility between them. We shall do this by making use of the insights into Vedanta offered by Swami Vivekananda (*Swamiji*, for short). Even a casual glance at Swamiji's life and works shows the remarkable success he achieved in expounding the essentials of religion, in a Vedantic light, in a way acceptable to the modern scientific mind. The extent of his success is evident in the appreciation he received from the intelligentsia of the nineteenth-century West, who had practically no exposure to Vedanta beforehand and had no reason to take these ideas seriously had they not been convincingly presented. The challenge he faced, in his own words, was to *"make out of dry philosophy and intricate mythology and queer startling psychology, a religion which shall be easy, simple, popular, and at the same time meet the requirements of the highest minds.*[1]*"* Given that many scientifically oriented people even today view religion as intricate, queer and illogical, his work is of great relevance in this discussion.

Historical Conflict

As mentioned earlier, there is a common perception that science and religion are opposed to each other. Part of the reason is historical. Modern science evolved in Europe in the Middle Ages by fighting its way against persecution by the Church, which found its dogmas and social influence endangered by the scientific method of fearless questioning and investigation. There were of course multiple factors involved in this conflict, including the existence of a politically powerful entity (which happened to be a religious organization in this case) feeling threatened by this new movement, and also the actual incompatibility between a dogmatic explanation to the natural world and a reason-based enquiry into the natural world. In any case, this bitter conflict continued for centuries and may be said to be still continuing in some ways. As a consequence, modern science as a pursuit has generally viewed religion with deep distrust and wariness, and several members of the scientific community have not only been non-religious but have been striving their utmost to "free" the society from religion.

There are, however, other sides to this picture which must be acknowledged. For one, all religions or religious philosophies do not have a necessary conflict with science. In India, religion is generally understood to be a matter of personal realization rather than a mere belief in a dogma or theory (more on this later), as a result of which there has never been a tradition of persecuting people for inquiring into the natural world. A great deal of freedom has been granted for explorations in the pursuit of truth as a result of which vast numbers of sects have peacefully coexisted over the millennia with each having its own view of life and reality. Outside India, the Islamic golden age of the eighth to fourteenth centuries AD in the middle east was also a period of much original progress in mathematics, astronomy, geography, biology, etc. Even in Europe, which was a major stage for science-religion conflict, several notable scientists(/mathematicians) held religious beliefs, including Isaac Newton, Carl Gauss,

Blaise Pascal, Bernard Riemann and Gregor Mendel (the father of genetics, who was an Augustinian friar, and in later life, an abbot), and some of them even considered their scientific pursuit as part of their religious pursuit. These examples give a clear hint that religion need not have any essential incompatibility with science.

Distinguishing Science and Religion

Before discussing the relation between science and religion, let us identify a working definition for these terms. We may take science to mean a systematic study of the physical and natural world through observation and experiment and the application of logical reasoning – a definition which includes all of the natural sciences (mathematics is also sometimes included). A robust feature of science is that it constantly adjusts itself to new discoveries of the natural world and tries to come up with better theories consistent with all the observed facts. While this may be viewed as a perennial challenge facing science, most scientists embrace this aspect for inspiring them to probe the natural world more and more closely and come up with increasingly accurate and sophisticated explanations for their observations. It is easy to see that this approach is fundamentally incompatible with any dogmatic explanation of reality which refuses to allow questioning and verification.

Religion is harder to define owing to the widely differing features of the various world religions and their apparent incompatibility. A common thread connecting the different religions was pointed out by Swamiji as follows-

A tremendous statement is made by all religions; that the human mind, at certain moments, transcends not only the limitations of the senses, but also the power of reasoning. It then comes face to face with facts which it could never have sensed, could never have reasoned out. These facts are the basis of all the religions of the world.[ii]

To see how this makes sense, we may recall that the founders or holy persons of the various religions, such as the Rishis (Hinduism), Buddha (Buddhism), Moses (Judaism), Jesus (Christianity), etc., are understood to have devoted themselves to various spiritual practices over the course of which they had certain revelations of truth (on matters relating to soul, God, moral law, etc.) which were then recorded in the holy books of these religions. The practice of these religions involves incorporating these revealed truths into one's life, by regulating one's life according to the moral rules suggested by them and by following any spiritual practices dictated by them. The existence of facts which cannot be sensed (through the five senses and man-made instruments), or even reasoned out, is a claim that would lie outside the domain of science and cannot therefore be tested, proved or disproved by science. While this suggests that the domains of science and religion do not fully overlap, it does not imply any necessary incompatibility between the two. Let us now look more closely at some of the common points of disagreement between science and religion.

Conflicting claims of religions and lack of verifiability

A seemingly legitimate criticism of religion is that the claims of the different religions about the ultimate truth seem to widely contradict with each other. It is of course true that even scientists have disagreements (sometimes vehement ones) among themselves regarding their theories, but there is usually a general consensus within the scientific community on what is confirmed fact (where there is no disagreement) and what is unconfirmed theory (where disagreements may exist). Even if the confirmed facts themselves are challenged, there are usually objective ways of evaluating and accounting for these challenges. In the case of religion, the disagreements seem to be much more severe (and often violent), and there seems to be no objective way of verifying these claims.

However, if we understand religion in the light of Vedanta, both these problems – disagreeing claims and lack of verifiability – may be addressed. Let us first take up verifiability. Following moral code of conduct and taking up one or more spiritual practices is not the ultimate goal of religion. Through these practices, the spiritual aspirant is expected to progress to a superconscious state, a state where one transcends the limitations of the senses and reasoning and directly perceives (and thereby verifies) the claims of religion. This can and should be done by anyone who is serious about religion. In Swamiji's words:

What right has a man to say he has a soul if he does not feel it, or that there is a God if he does not see Him? If there is a God we must see Him, if there is a soul we must perceive it; otherwise it is better not to believe. It is better to be an outspoken atheist than a hypocrite.[iii]
Man wants truth, wants to experience truth for himself; when he has grasped it, realised it, felt it within his heart of hearts, then alone, declare the Vedas, would all doubts vanish, all darkness be scattered, and all crookedness be made straight.[iv]

It has to be understood that these were not mere empty poetic words for Swamiji. In his own life, even as a teenager he went around asking religious preachers whether they

actually *saw* God and whether it was possible to do so. He was only satisfied by Sri Ramakrishna (whom he later accepted as his guru), who answered both questions in the affirmative and then went about training him towards this end. Swamiji's lectures and written works came long afterwards, by which time he felt ready to speak about these truths from the authority of his *own* experiences.

Accepting that verification of spiritual truths is indeed possible, what is the explanation for conflicting claims put forth by the religions? Does it mean most of them are wrong and only one is correct? A plausible explanation comes from the words of Sri Ramakrishna, a person who conducted wider and deeper explorations in the world of religion/spirituality than any other person in recorded history. While speaking about the realization of Brahman (non-dual existence) in Advaita Vedanta, he said (translation from Bengali):

If you ask me what Brahman is like, all I can say is that It cannot be described in words. Even when one has realized Brahman, one cannot describe It. If someone asks you what ghee is like, your answer will be, 'Ghee is like ghee.' The only analogy for Brahman is Brahman. Nothing exists besides It.[v]

It is next to impossible to describe something which has no *analogue*, *i.e.* something which is not similar to any other thing. When we combine this profoundness of the spiritual truths with the differences in culture, language and time at which various spiritual experiences are recorded in the various religious books, it is hardly surprising that there are different descriptions of reality. Of course, the inability of language to describe concepts is a familiar problem in physics – it was encountered frequently during the early days of quantum mechanics, for example in the context of wave-particle duality. The problem was not with light, but with the pre-defined meanings of the words "wave" and "particle" which were unable to convey the nature of light in its entirety. Swamiji comprehensively summarizes the matter of differing descriptions of reality using an illustration -

Suppose a man is journeying towards the sun, and as he advances, he takes a photograph of the sun at every stage. When he comes back, he has many photographs of the sun, which he places before us. We see that not two are alike, and yet, who will deny that all these are photographs of the same sun, from different standpoints?... In the same way, we are all looking at truth from different standpoints, which vary according to our birth, education, surroundings, and so on. We are viewing truth, getting as much of it as these circumstances will permit, colouring the truth with our own heart, understanding it with our own intellect, and grasping it with our own mind. We can only know as much of truth as is related to us, as much of it as we are able to receive. This makes the difference between man and man, and occasions sometimes even contradictory ideas; yet we all belong to the same great universal truth.[vi]

Widely variant religious practices

Religions vary widely in their observances and practices. Some are highly ritualistic and ceremonial, some are philosophical, some rely chiefly on prayer, others on service to human beings, some on reasoning and reflection, and so on. How can they all be valid paths towards perceiving the same reality? This can be understood by appreciating the role played by spiritual practices.

Spiritual practices seek to raise the practitioner to the superconscious state where spiritual truths can be directly perceived. The process involves regulating one's life and thinking in such a way as to prepare the body and mind for receiving spiritual experiences. Since human beings vary widely in their natural temperament – some being more rational by nature, some more emotional, some practical, some contemplative, some strong-willed, etc., it is understandable that the same method may not be suitable all people in a society, and even less so for people hailing from different communities, cultures, or nations. The peculiar differences in methods and practices followed by religions can therefore be understood as adapted for different personality types and different cultural upbringings.

The idea is somewhat similar to the differing cuisine choices of people. Ultimately, food from all cuisines end up nourishing the eater, but that doesn't stop people from having personal preferences, often dictated by cultural and national backgrounds. In the field of religion, ideally each person should have the freedom to choose from the different religious traditions available. In India, historically, this freedom always existed, as demonstrated by the concept of *Ishta Devata*, *i.e.* cherished deity, which varied from person to person, even among people of the same family. As per Vedanta, the four Yogas – Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga and Raja Yoga – are the four general classes of approaches aspirants may take in their spiritual efforts, suiting the different types of temperaments. Thus, the diversity of practices existing among religions is a response to the diversity in human nature and is an indicator of *sophistication* of religion

rather than *inconsistency*, as it is sometimes assumed.

The roles of faith and reason

One of the features of religion most unpalatable to the scientifically minded is its emphasis on faith, which seems to be incompatible with the scientific method of questioning everything. Even accepting that religious pursuit may not be completely meaningless, how can someone with an inclination for scientific reasoning take seriously a pursuit that relies so much on faith?

Faith has a justifiably important role to play in spiritual life. A firm faith in the validity of the pursuit and the efficacy of the methods in taking one to the goal allows aspirants to focus their energy on moving forward on the path. In the absence of such faith, at every turn they will have to fight doubts regarding the validity of their pursuit or efficacy of their methods, and this can slow the progress significantly even to the point of destroying all enthusiasm and possibility of progress. To take a simple example, if two children are asked to run across a very narrow bridge (without railings) and informed that the water below is shallow, the child who has faith in the information would put its whole energy on running fast, while the child who doubts the instruction may go much slower with unnecessary caution due to fear of drowning. This factor also applies to pursuits such as sports or even science. A person who starts out with innate faith in his/her ability to excel in a sport or solve research puzzles will be able to persevere through the occasional difficulties and work energetically towards the goal; on the other hand, a person constantly doubting his/her own ability or the efficacy of the approach or the feasibility of the goal can easily get overwhelmed by the challenges and accept failure prematurely.

As explained above, the goal of religious practices is to verify religious truths for oneself; so the "faith" in the efficacy of the effort is in fact faith-pending-verification, as in any other pursuit, rather than a dogmatic-faith-with-zero-hope-of-verification. This importance given to faith in religious pursuits may sometimes give the impression that reason has no role to play in religion. This is far from true. It is essential for a serious practitioner of religion to employ reason, logic and careful observation so as to ensure that they are moving forward in the correct direction. The roles played by reason and faith in a religious pursuit may be compared to the roles of the steering wheel and the engine of a car. The steering wheel (reason) is undoubtedly necessary to navigate the car correctly on the road (avoid mistakes), but the actual thrust forward is given by the engine (firm faith in the efficacy of the effort and worthiness of the goal). Swami Vivekananda indicated a form of faith which is eminently compatible with modern life in saying

> *Our first duty is not to hate ourselves, because to advance we must have faith in ourselves first and then in God. He who has no faith in himself can never have faith in God.*[vii]

It should not be thought that this kind of faith in oneself and one's own power of judgement and critical analysis on the religious path is a completely new feature introduced by Vivekananda purely due to his modern/western education. Sri Ramakrishna, with practically no modern education, was seen on many occasions to critically examine his own spiritual experiences and delighted in their comparison and cross verification with independent sources such as scriptures (which he had not previously studied) and the experiences of others. Moreover, he was overjoyed to see disciples like Narendranath (Vivekananda's pre-monastic name) and others mercilessly putting to test the consistency of his words and deeds before accepting them. Far from taking offence at their irreverent testing, he strongly encouraged them to build conviction in a natural way, just as a competent teacher of science may encourage students to re-derive the results taught to them.

Contribution of religion: the logic behind morality

Morality is an important component of all religions, and it is evident that moral rules prescribed in the various religions share some common features. Nevertheless, there are also differences between religions and some acts considered moral by some religions are considered immoral by others. These differences are an added reason why many thinking minds find religions unsatisfactory, and often choose to live by their own personal (and often arbitrary) morality, or merely follow the laws of the land.

If it were possible to derive a system of morality purely from scientific understanding of human nature, that may perhaps have been universally acceptable. However, if we go by the approach of natural science, we end up with a view of the world as a mass of chemical reactions (or, at a deeper level, particle/field interactions and spacetime curvature, or strings/branes, or something even deeper). In this context, the only difference between a happy person and a sad person, or a healthy body and an injured body, or a world with a flourishing human population and a world destroyed by pollution or nuclear war, is in the nature of the chemical reactions taking place; from

that viewpoint, there is no reason to *value* one over the other, or look for a *meaning* to life. This view is known as nihilism. But since it is practically impossible to live without any meaning or goal in life, even those who accept this line of reasoning usually end up manufacturing some goal of life, such as "bringing as much happiness as possible to as many people as possible" (utilitarian good), or "ensuring the survival of my genetic line", or "enjoying my own life as much as possible (hedonism), or some such thing, and build their moral system based on this goal. This choice is essentially arbitrary, varies from person to person, and is not dictated by pure reason but by personal preferences.

Swamiji raises this issue and then points out that the one system of thought that can hold on to rationality and yet come up with a basis for a system of morality is Advaita Vedanta, which asserts the unity of all existence.

What is the reason that I should be moral? You cannot explain it except when you come to know the truth as given in the Gita: "He who sees everyone in himself, and himself in everyone, thus seeing the same God living in all, he, the sage, no more kills the Self by the self." Know through Advaita that whomsoever you hurt, you hurt yourself; they are all you.[viii]

Therefore, the simple reason for seeking the well-being of others is that the others are not really "others" and the well-being of anyone (even animals, plants, etc) is really the same as one's own well-being. This gives a simple basis for morality that is fully universal, based upon which the do's and dont's of all situations can be worked out.

Conclusion

We have taken up in this article several points where there seem to be conflicts between science and religion, and seen how Vedanta as expounded by Swamiji indicates ways to resolving all these conflicts. In a world where various types of violent conflicts ongoing, it hardly needs to be emphasized that such ideas that can bring about the harmony of human pursuits are invaluable. The onus is now on the educated youth of today to reflect deeply on these ideas, develop creative ways of applying them, and achieve excellence in religious, scientific and other pursuits at the individual and the collective levels.

Further Reading

• Reason and Religion by Swami Vivekananda, Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 1, Lectures and Discourses

• Raja Yoga: Introductory by Swami Vivekananda, Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 1, Raja Yoga

• Will the twain meet?, Prabuddha Bharata, May 1929, Editorial (Editor: Swami Ashokananda)

• Philosophy, Morality, and Religion, Prabuddha Bharata, February 1955, Editorial (Editor: Swami Satswarupananda)

---

i. Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama (12th Edition) (C.W.), Volume 5, pp108 (Epistles First Series - 58)

ii. C.W. Volume 2, pp71 (Jnana Yoga – The Necessity of Religion)

iii. C.W. Volume 1, pp145 (Raja Yoga – Introduction)

iv. C.W. Volume 1, pp146 (Raja Yoga – Introduction)

v. The Gospel of Sri Ramakrishna, Sri Ramakrishna Math Chennai, pp920 (In the Company of Devotees at Shyampukur – Friday, October 30, 1885)

vi. C.W. Volume 2, pp367-368 (Practical Vedanta and Other Lectures – The Way to Realization of a Universal Religion)

vii. C.W. Volume 1, pp59 (Karma Yoga – Each is great in his own place)

viii. C.W. Volume 3, pp448 (Lectures from Colombo to Almora – The Vedanta)

Thank you Dreams

Krishna Tewary
(2nd year, 2020-2022)

Thank you dreams.
You are not what everyone seems.
For me, you are the way to get
The dreams have not done yet.
I want to fly, I want to run
I want to jump to get the life's fun.
But unfortunately, it's just a dream
Which I can fulfill amidst you, my Dream!
Therefore I am thanking you dream,
For giving my thoughts a real theme.

দুনিয়ার মেয়েরা এক হও

শালিনী মাজি
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

আমাদেরও কাজ চাই,
দুইবেলা ভাত চাই,
একই কাজে চাই, একই পরিমাণে মাইনে,
আরও লেখাপড়া চাই,
বিপদেতে সাড়া চাই,
লিঙ্গসাম্য চাই, বেশিকিছু চাইনে।
অফিস ফিরতি পথে,
ক্লান্ত তোমায় দেখে,
অনায়াসে সিট ছেড়ে দিতে পারি আমিও,
তুমি শুধু বাড়ি ফিরে,
মুখ ধুয়ে, জামা ছেড়ে,
রান্না করতে দেখে সাথে হাত লাগিও।
দূরদেশে যেতে চাই,
একা রেঁধে খেতে চাই,
ভ্রূণ হয়ে চাই, পৃথিবীর আলো দেখতে,
শাঁখা, পলা সিঁদুরে,
বোরখা ও হিজাবে,
অকারণে চাই না, নিজেদের বাঁধতে।
রাজনীতি বুঝি ভাই,
দৃপ্ত কণ্ঠে চাই,
স্বেচ্ছায় সন্তান ধারণের অধিকার,
বিশ্বের যত মেয়ে
একজোটে, চেঁচিয়ে,
বলো
লিঙ্গসাম্য চাই, ঐটাই দরকার।

লুচির সাতকাহন

সৌমিত রায়
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

গ্লোবালাইজেশন-এর যুগেও 'গোলগালালাইজেশন' থেকেও বাঙালী যাকে বঞ্চিত করে দেননি তিনিই হলেন বাঙালীর লুচি। মন খারাপ হোক বা ভালো, রান্নাঘরে তার উপস্থিতি মনকে সর্বদা উৎফুল্ল করে তোলে। লুচির আভিজাত্য বরাবরই তার সমসাময়িক পুরি বা কচুরির তুলনাই সহস্রগুণে বেশি। বাংলা সাহিত্যে একাধিক জায়গায় আছে লুচির এই সহজ-সরল গুণের প্রকাশ। 'বাঙালির খাদ্যকোষ'-এর রচয়িতা মিলান দত্তের মতে, **"লুচি হল বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় নোনতা খাবার।"**

বাংলায় কবে লুচি খাওয়া শুরু হয়েছে তা জানা যায় না। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক কৌশিক মজুমদার বলেছেন, লুচি কোনো দেশজ বা বাংলা শব্দ নয়। কোন সংস্কৃত প্রাচীন কাব্যে লুচি বা লুচির মত কোনো শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এমনকি বেদ-পুরাণ রামায়ণ-মহাভারত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থেও লুচির কোনো উল্লেখ নেই। অনেকের মতে মুসলমানেরা আসার পর বাঙালি লুচি তৈরি করতে শিখেছে এবং 'আইন-ই-আকবরি'-তে লুচির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাল যুগের বিখ্যাত চিকিৎসক চক্রপাণি দত্ত রচিত 'দ্রব্যগুণ' গ্রন্থে লুচির বর্ণণা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

"সুমিতায়া ঘৃতাক্তায়া লোপ্ত্রীং কৃত্বা চ বেল্লয়েৎ।
আজ্যে তাং ভর্জয়েৎ সিদ্ধাং শষ্কুলী ফেণিকা গুণাঃ ॥"

যার অর্থ হল, 'গম চুর্ণকে ঘি দিয়ে মেখে, লেচি করে বেলে, গরম ঘিয়ে ভেজে তৈরী হয় শষ্কুলী, যার গুণ ফেণিকার (বাতাসার) মত। 'শষ্কুলী'-ই হল লুচির আদি রূপ। ১৮৫৪ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলনি কুলসর্বস্ব' গ্রন্থে লুচিকে উত্তম ফলারের সর্বপ্রথম উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

'লুচি' শব্দটির বুৎপত্তি নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। অনেকের মতে লুচি সম্ভবত হিন্দি 'লুচ' বা 'লুচলুচিয়া' থেকে এসেছে যা পিচ্ছিল বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। ঘিয়ে ভাজা লুচি হাত থেকে পিছলে যায় বলে এর নামকরণ হয়েছে লুচি। আবার অনেকের মতে, লুচি শব্দটি এসছে সংস্কৃত 'লোচক' থেকে যার অর্থ চোখের মণি। লুচি যেহেতু চোখের মণির মত গোল, তাই তার এমন নাম। তা সত্যি যে, খাদ্যরসিক বাঙালির চোখের মণিই হল লুচি।

পাল যুগে তিন প্রকার লুচি প্রচলিত ছিল: খাস্তা, সাপ্তা ও পুরি। ময়ান দিয়ে ময়দার লুচি বেলে তৈরি হত খাস্তা, ময়ান ছাড়া ময়দার লেচি বেলে তৈরী হত সাপ্তা এবং ময়দার পরিবর্তে আটা ব্যবহার করলে তাকে বলা হত পুরি। তুলসী দাসের সময় ভারতে সর্বজনপ্রিয় খাদ্য হিসাবে পরিগণিত ছিল লুচি। পাল যুগের খাস্তা লুচিই বর্তমানে বাঙালীর প্রিয় লুচি।

বাংলার প্রথম রান্নার বই ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের 'পাকরাজেশ্বর' গ্রন্থে লুচি তৈরির প্রণালীতে বলা হয়েছে,

"দধি ঘৃত মর্দ্দিতোষ্ণোদক সহিত দলিত মণ্ডাকার নির্ম্মিত ঘৃতভৃষ্ট সমিতা।"

অর্থাৎ দই সহযোগে উষ্ণ জলে ময়দা মেখে লুচি তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখন সেই পদ্ধতিতে আর লুচি তৈরি হয় না। পরবর্তীতে ১৩৩১ সনে প্রকাশিত দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ির বধূ কিরণলেখা রায় তার রান্নার বই 'জলখাবার'-এ সাধারণ লুচি তৈরির বিবরণে লুচি তৈরিতে ময়দা কে শুধু ঘি দিয়ে মাখবার কথা বলেছেন। এ ছাড়াও আরও দু'রকম লুচি তৈরির কথা বলেছেনঃ ময়দার সাথে সুজি মিশিয়ে 'টব্‌গা' লুচি আর মুচমুচে 'কচ্‌মচিয়া' লুচি।

লুচির মূল উপাদান ময়দা, জল, লবণ ও ঘি হলেও অনেকক্ষেত্রে লুচিকে ফুলকো করে তোলার জন্য সামান্য সুজি ব্যবহার করা হয়। ঘি-এর জায়গায় অনেকসময় সর্ষের তেল, সাদা তেল বা ডালডাও ব্যবহার করা হয়। লুচির মধ্যে কোনো দাগ না থাকার জন্য ময়দার সঙ্গে দুধ ব্যবহারও অনেক জায়গায় দেখা যেত। ফোলা লুচির উপর এবং নীচের স্তর বা অংশটি সমান বা পাতলা হয়, তাকে ফুলকো লুচি বলে। ফুলকো লুচিই বারংবার বাঙালিকে বাধ্য করে প্রেমে হাবুডুবু খেতে।

ফুলকো লুচি সাধারণত বেগুনভাজা, ডাল, আলুর দম বা মাংসের সাথে খাওয়া হয়। বাঙালি হিন্দু অভিজাত পরিবারে তিন আঙুলের অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী এবং মধ্যমার ডগায় লুচি ছিড়ে তরকারী দিয়ে খাওয়ার চল আছে। বিভূতিভূষণের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর চালের বাতায় লুচি ভাজার খুন্তি গুঁজে রাখতেন হাজারী ঠাকুর। উল্লেখ্য যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন'-এ গভীর রাতে উপেন্দ্রাথ-কে বলা কিরণময়ীর সংলাপ, **"আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এসো, দু'খানা লুচি ভেজে দিতে আমার দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।"** সত্যজিৎ রায় ১৯৬৪ সালে নির্মিত

চারুলতা ছবির দৃশ্য

চারুলতা ছায়াছবিতে ভূপতির চরিত্রকে উনবিংশ শতকের কলকাতায় নব্য বাবুসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে দৃশ্যায়িত করতে গিয়ে তিন আঙুলে লুচি খাওয়া দেখিয়েছেন।

লুচির আকৃতি স্থান-কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়েছে বারবার।

কান্তজীউ মন্দির

নন্দী পরিবারের ঠাকুরবাড়ি

সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখার্জির মতে কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলোয় লুচির আকৃতি বড় এবং সেই আকৃতি কলকাতার দিকে ক্রমশঃ কমতে থাকে। তথ্য হিসাবে বলা চলে গ্রাম বাংলায় প্রচলিত লুচির ব্যাস ছয় থেকে আট ইঞ্চি হলেও কলকাতায় প্রচলিত লুচির ব্যাস তিন থেকে চার ইঞ্চি। দিনাজপুর জেলার কান্তজীউ মন্দিরে এককালে যে লুচি তৈরি হত তার আকৃতি ছিল একটি বগি থলির মত। সেই লুচি দু'হাতে ছিঁড়ে ডাল আর ক্ষীর দিয়ে খাওয়া হত।

মালদহ জেলার লুচির আকৃতি প্লেটের মত যার ব্যাস বারো ইঞ্চিরও বেশি। ইংরেজ বাজারের নিকটবর্তী সাদুল্লাপুর শ্মশান অঞ্চলে একধরনের লুচি পাওয়া যায়। হাতির পায়ের মতো আকার হওয়ায় এর নাম হাতিপায়া লুচি। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীরা এই লুচি খেয়ে থাকেন। আবার মেদিনীপুর জেলার রাধামোহনপুর স্টেশনের কাছে পলাশী গ্রামে নন্দী পরিবারের ঠাকুরবাড়ির ভোগে নিবেদিত লুচির ব্যাস এক থেকে দেড় ইঞ্চি। গবেষক প্রণব রায়ের মতে এটি সম্ভবত ভারতের ক্ষুদ্রতম লুচি। বাংলায় যথেষ্ট চল আছে পদ্মলুচির। কলকাতার ঘটিদের মধ্যে কথ্য ভাষায় লুচিকে 'নুচি' বলা হয়। পূর্ববঙ্গীয় লব্‌জে লুচিকে আদর করে বলা হয় ল্যাসাই। দামু মুখোপাধ্যায় তার প্রবন্ধে বলেছেন, ময়দা ও ক্ষীর একসঙ্গে মেখে ফুচকার মতো খুদে লুচি ভেজে তোলার পর মিছরি দিয়ে জ্বাল দেওয়া ঘন আঠালো দুধে ফেলে পরিবেশন করা হত 'ল্যাসাইয়ের পায়েস' বা লুচির পায়েস। দুর্গাপুজো সহ একাধিক পুজোয় দেব-দেবীর ভোগ হিসাবে লুচি নিবেদন করা হয়।

হাতিপায়া লুচি

লুচিভোগ

পদ্মলুচি

লুচির পায়েস

উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের ঠিক পাশেই হরিদাস মোদকের ২৫০ বছর পুরোনো দোকানের লুচি অত্যন্ত বিখ্যাত। প্রায় ছয় প্রজন্ম ধরে চলা এই দোকানে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, রাণি রাসমণি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এখানে আজও কলাপাতায় লুচি আর আলুর তরকারি দেওয়া হয়।

হরিদাস মোদকের দোকান এবং সেই দোকানের লুচি

এককালে বিয়েবাড়ির ভোজে প্রথমেই থাকত লুচি ও বোঁটা-সহ লম্বা বেগুনভাজা। শোভাবাজার রাজবাড়ির মেয়ে কৃষ্ণ শর্বরী দাশগুপ্ত তাঁদের পরিবারের ১১২ বছরের পুরোনো বিয়ের বৌভাতের মেনু কার্ড আপলোড করেছিলেন যাতে লুচি এবং পদ্মলুচির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৭০-এর দশক থেকে লুচির সাথে চলতে থাকে কাশ্মীরি আলুর দম।

কুমার রামেন্দ্র কৃষ্ণ দেবের

ভোজ ।

শোভাবাজার রাজবাড়ির সেই মেনুকার্ড

প্রতিদিন লুচি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। লুচি ভাজার সময় অতিরিক্ত তেল শোষণ করে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী না। লুচি ভাজার পর সেই তেল দিয়ে রান্না করলে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। তাই চিকিৎসকদের মতে সপ্তাহে একদিন লুচি খেলে সমস্যা হয় না। তাই চিকিৎসকদের মতে সপ্তাহে একদিন লুচি খেলে সমস্যা হয় না। প্রতি ১০০ গ্রামে লুচির পুষ্টিগত মানঃ

প্রতি ১০০ গ্রাম (৩.৫ আউন্স) পুষ্টিগত মান		
শক্তি	১,১৬৩ কিজু (২৭৮ kcal)	
শর্করা	45.23 g	
শ্বেতসার	0 g	
চিনি	0.21 g	
খাদ্যে ফাইবার	4.6 g	
স্নেহ পদার্থ	8.16 g	
সুসিক্ত স্নেহ পদার্থ	1.231 g	
ট্রান্স স্নেহ পদার্থ	0 g	
একঅসুসিক্ত	3.232 g	
বহুঅসুসিক্ত	3.104 g	
ওমেগা-৩	0 g	
ওমেগা-৬	0 g	
প্রোটিন	7.3 g	
চিহ্ন ধাতুসমূহ		
পটাশিয়াম	156 mg	(3%)
সোডিয়াম	615 mg	(41%)

একক
µg = মাইক্রোগ্রামসমূহ • mg = মিলিগ্রামসমূহ
IU = আন্তর্জাতিক এককসমূহ

Percentages are roughly approximated using US recommendations for adults.

তথ্য: wikipedia

প্রতিদিন লুচি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। লুচি ভাজার সময় অতিরিক্ত তেল শোষণ করে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী না। লুচি ভাজার পর সেই তেল দিয়ে রান্না করলে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। তাই চিকিৎসকদের মতে সপ্তাহে একদিন লুচি খেলে সমস্যা হয় না। তাই চিকিৎসকদের মতে সপ্তাহে একদিন লুচি খেলে সমস্যা হয় না। প্রতি ১০০ গ্রামে লুচির পুষ্টিগত মানঃ

যুগ যুগ ধরে লুচি বাঙালী ঐতিহ্যের ধারা বহণ করে চলেছে। আজও ছুটির বিশেষ করে রবিবারের সকালেই হেঁশেল থেকে মন মাতাতে থাকে লুচি। সবশেষে অমৃতলাল বসুর কথায় ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গানে সুর মিলিয়ে বলাই চলে-

"ও গো লুচি, তোমার মান্য ত্রিভুবনে,
তুমি অরুচির রুচি, মুখমিষ্টি শুচি
খাইয়ে ধন্য জীবনে..."

তথ্যসূত্র ঃ
১. বাঙালির খাদ্যকোষ- মিলন দত্ত
২. নোলা - কৌশিক মজুমদার
৩. লুচি - উইকিপিডিয়া
৪. এক যে আছে লুচি - দামু মুখোপাধ্যায়
৫. ছবি সৌজন্যে: www.google.com

অহং-এর দাগ, লেগে আছে কত,
সে দাগ, যায় না দেখা,
যায় না ছোঁয়া, শুধু সহ্য করা ভার।
এই দাগ ভেদ করে,যাই যখন ওই পারে
দেখি, রয়েছো দাঁড়ায়ে, হৃদয়পুরে,কাছে টেনে নিতে
চুপটি করে আছো, চেয়ে নয়ন পানে,
শান্ত শীতল মুখে,কোনে কথা নাই,
হঠাৎ অজান্তে, অহং-এর সব ভার, গেছে নেমে,
হৃদয় মাঝে, অসীম সুখ জাগে,
কী জানি কী নেশা, মাতাল করে তোলে,
হঠাৎ মনে পড়ে যায়, পুরোনো সব স্মৃতি,
তোমায় চিনতে পেরে,অশ্রুসিক্ত আঁখি,
কতকাল আর রবে, এমন অপেক্ষা ভরে,
হে সরল, সুন্দর, আনন্দে মগন,
সার্থক, তব ভালোবাসা,
কত জনমের, কত শত স্মৃতি,
অস্থির করে তোলে, তোমার কাছে যাই ছুটি,
হঠাৎ কীসের আবরণে, সবদিক যায় ভরে,
অহং-এর জাল আবার দেয় ঢেকে,
আবার একা হয়ে যাই, জগৎ পানে চাই,
অহং-এর ভারে যায় মরে।

বিন্দুভাবনা

সৌভিক ভট্টাচার্য্য
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০১৯-২১)

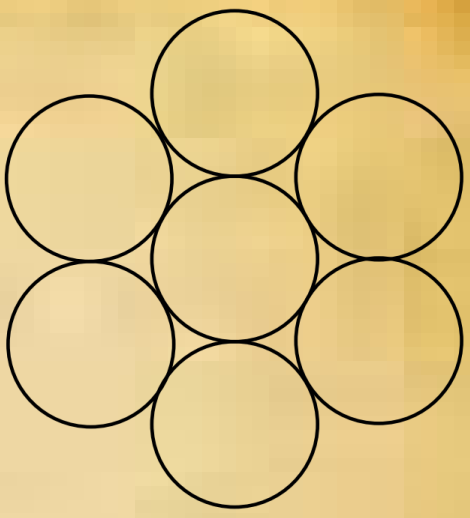

সেদিন Isotropy আর Homogeneity of space পড়তে পড়তে উদ্বেলিত হয়ে রাত্রের তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পদার্থবিদ্যার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাবছিলাম আকাশের ঐ তারার সজ্জা কি Homogeneous! নাহ্, তা নয়। কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ওগুলো তা হতে পারে, ভেবেও যখন কিছু পেলাম না, তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কল্পনার রসদে যখন টান পরে তখন সত্যিকার কোনো বিষয়ের ওপর স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয় না। তাই আমাদের পথচলা উচিৎ বুদ্ধির দ্বারা। যেখানে প্রধান অস্ত্র হল যুক্তি এবং যথার্থ গণনা। কল্পনা করা তো মনের কাজ। বুদ্ধি তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী।

কোনো space-কে যখন আমরা বর্ণনা করি, তখন প্রথমেই দেখি তার মাত্রা (dimension) কত। ঐ space-এ কি কি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে; সেটি কঠিন, তরল না গ্যাসীয় বায়বীয় মাধ্যম, নাকি এদের সংমিশ্রনে তৈরি কোনো মিশ্রিত অবস্থা। এটি নিশ্চিত করার পর বুঝতে চেষ্টা করি মাধ্যম গঠনকারী মৌলিক কণাগুলি ঐ space-এ কিভাবে সজ্জিত রয়েছে। খুব সাধারণভাবে যদি Isotropic ও Homogeneous space-এর কথা বলি, তবে space-এর কোন বিন্দুর সাপেক্ষে সবদিকে (4π ঘণকোণ) একই সজ্জায় হল Isotropy। অপরপক্ষে, space-এর যেকোনো অংশের অতিক্ষুদ্রাংশ অপর কোনো অংশে প্রতিস্থাপ-নযোগ্য হলে, তা Homogeneous বা সমজাতীয় space, অর্থাৎ এই space-এর অতি ক্ষুদ্র অংশগুলি (আরো ভালো করে বললে প্রতিটি বিন্দুই) identical।

এখন, এটি খুব সাধারণভাবেই প্রমাণ করা যায় যে কোনো space isotropic হলেও তা Homogeneous নাই হতে পারে। কিন্তু Homogeneity-এর শর্তানুযায়ী, প্রতিটি বিন্দু যদি identical হয়, তবে প্রতিটি direction-এর সজ্জা কি একইরকম হতে পারে না? -তা একমাত্র সম্ভব, যদি আমরা বিন্দুকে perfectly zero dimension ধরে নিই। কিন্তু, যদি বিন্দুর কোনো dimension থেকে থাকে, তবে সেটিই কিছু ক্ষেত্রে Isotropism-এর পরিপন্থী হতে পারে। প্রাচীন গণিত শাস্ত্রানুযায়ী, বিন্দুর কোনো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, ব্যাস, ব্যাসার্ধ, ক্ষেত্রফল কিছুই নেই। আছে শুধুমাত্র অবস্থান। তাই conceptually, বিন্দু শূন্যমাত্রিক। কিন্তু সত্যিই কি বিন্দু শূন্যমাত্রিক? জড়জগতে যাকে আমরা বিন্দু বলি, সেই বিন্দুতে উপস্থিত কণার কিছু না কিছু তো বিস্তার রয়েছেই। তাই বলতে পারি বাস্তবের কোনো বিন্দুই মাত্রাবর্জিত নয়। খুব বেশি জটিলতাই না গিয়ে, মনে করলাম বিন্দু একটি ছোটো বৃত্ত। তাহলেই মধ্যস্থিত বৃত্তটির সাপেক্ষে space-এর isotropy, আর থাকছে না। তার কারণ অবশ্যই Interstitial স্থানগুলির অস্তিত্ব।

এবারে বিন্দুর কথায় আসি। নিঃসন্দেহে এটি একটি interesting বিষয়। কেন এমন দাবি করছি তার একটা কারণ বলতে পারি যে, যে কোনো endless, unbounded জিনিসই interesting, বিন্দুও এদের সমগোত্রীয়। Perfect point আমরা আঁকতে পারি না। কলম যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, প্রতিবারেই বিন্দু আঁকতে গিয়ে বৃত্ত এঁকে ফেলি। এভাবে ছোট করতে করতে বিন্দুকে যদি সমস্ত পর্যবেক্ষণের অতীত করে ফেলি, তবুও বিন্দু তার মাত্রা হারায় না; বরং সে পর্যবেক্ষণের অতীত হয়ে গিয়ে আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। হয়ত সে অসীম মাত্রাকে নিজের মধ্যে স্থান দিয়ে নিজে unrevealed থেকে যায়। তাই মনে হয়, বিন্দু একটা ধারণা, যার শুধুমাত্র position আছে। এটিকে আঁকা সম্ভব নয়। We draw or assume a point in space by our convenient way. বিন্দু দ্বারা গঠিত হলেও একটি বিন্দু একটি grand macrosystem-ও হতে পারে। আমাদের দেখা সবচেয়ে বড়ো ক্ষেত্র হল আকাশ। যেখানে সবাই যুক্তি খোঁজে। তেমনই ধ্যানী পুরুষেরা মুক্তি খোঁজেন বিন্দুতে। তাঁরা বিন্দুতে মনসংযোগ করে নিজেদেরকে অসীম শক্তির সাথে যুক্ত করেন। ভরা নক্ষত্রাকাশের মতোই সমৃদ্ধ মানুষের কল্পনা-আকাশের প্রতিটি বিন্দু। মানুষ যেখানে মিলিত হতে চায় সেই বিন্দুগুলি; যা আপাত মাত্রাহীন হয়েও অসীম মাত্রাযুক্ত।

গোমুখের পথে

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক এবং প্রধান,
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, RKMVERI

আপন কর্মের দ্বারাই তিনি কৃতি হয়েছেন। এবং, যে কর্ম তিনি করেন তা প্রকৃষ্ট রূপে করেন। তিনি শুধু কৃতি নন, প্রকৃষ্ট কৃতি। তিনি 'প্রকৃতি'। যথা অর্থেই।

প্রকৃতি যে-ভাবে যে-কর্ম করেন, সেই কর্মের ধারায় তার সেই ভাবকে তিনি ধারণ করেন। প্রকৃতির ভাবের এই যে ধারা, সেই ভাবধারা কে সাধারণ-ভাবে বলি প্রকৃতির ধর্ম।

প্রকৃতির সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে, প্রকৃতির সঙ্গে ভাব জমতে থাকে। জমতে জমতে, যে ভাবছে - তার ভাব, যাকে ভাবছে - তার ভাবে লীন হতে থাকে। যিনি ভাবছিলেন, তার তো 'ভাব' ছিলই, প্রকৃতির ভাবে ভাবিত হয়ে যাওয়ায়, প্রকৃতির ভাবের ধারা তার আপনার ভাবে সঞ্চারিত হয়। তখন প্রকৃতির ধর্ম তিনি আপনার ভাবে, নিজের মতো করে, অনুধাবন করেন। তিনি 'বিজ্ঞানী'।

বিজ্ঞানী আপন ভাবে প্রকৃতিকে ভেবে ভেবে, প্রকৃতির ভাব-প্রাসাদে প্রবেশ করেন। রহস্যময়ী প্রকৃতি-ও বিজ্ঞানীর ভাবের ঘরে আপনার ভাবের আবরণ উন্মোচন করেন। পাশ্চাত্যের ভাবে প্রকৃতির এই যে আবরণ বা "cover" - তার উন্মোচনের নাম "dis-cover-y"।

প্রকৃতিভাবের এক একটি বিশেষ ধারা - এক একটি ভাবের অন্তঃসলিলা ফল্গু। ওপর-ওপর শুষ্ক বালির চোখ-ধাঁধানো চিক্ চিক্, আর মাঝে-মধ্যে দণ্ডায়মান খেজুরের ঝোপ। ওপর-ওপর ভাসলে -

দৃষ্টি-ঝলসে জীবন-ধাঁধা,
খাজুরিয়া আলাপে বাক্য বাঁধা।

যে তৃষ্ণা মেটে না তাতে, সে তৃষ্ণায় যখন যে তৃষ্ণার্ত হয়, সে তৃষ্ণার প্রকৃতি তখন তার ভাবকে ব্যাকুল, একাগ্র করে তোলে এক বিন্দু ভাবরসের সন্ধানে।

প্রকৃতি তার এক ধারায়, 'মুক্ত'-কে সযত্নে ঝিনুকের বন্ধনে সমুদ্রের অতলে স্থাপন করে আপনার মুক্ত-ধারাকে অধরা রাখতে প্রয়াসী আপনার-ই ভিন্ন ধারার দৃষ্টিপথ হতে। আবার আপনার রচিত ব্যূহ হতে মুক্তের মুক্তিরপথের পরিকল্পনাটি ডুবিয়ে রাখেন চিত্ত-হ্রদের অতলে। যথাসময়ে যার চিত্তে সেটি ভেসে ওঠে, সে ডুবুরি হয়ে ডুব দেয় মুক্ত-সন্ধানে। উপরের উত্তালতার গভীরে, প্রশান্ত প্রদেশে ডুবে ডুবুরি ঝিনুক-বদ্ধ মুক্ত-কে, করতলে তুলে, মুক্ত করে। এই-'ভাবে', ভাবের লীলাকে প্রকৃতি র কর্মে রূপদান। গভীরে না ডুবলে রত্ন লাভ হয় না। এ প্রকৃতির ই ধারা।

তৃষ্ণার্ত যে জন প্রকৃতির ভাব-ফল্গুতে ডুব দেন, তিনি বিজ্ঞানী। গভীরে যেতে যেতে একসময় প্রকৃতির সেই অন্তঃসলিলা ফল্গু-স্রোতের সন্ধান পেয়ে তাতে সিক্ত হয়ে রত্ন-লাভ করেন। আপন অন্তঃপুরে বিজ্ঞানীকে আহ্বান করে এনে তার হাতে আপনার লুকানো রত্ন সমর্পণ করার সব ব্যবস্থা প্রকৃতি ই করে রাখেন। অন্তঃপুরে প্রবেশের অনন্ত পথের যে বিশেষ পথটি যে বিশেষ বিজ্ঞানীর জন্য পরিকল্পিত, সেই মতো সে বিজ্ঞানীর একটি বিশেষ মতে বিশ্বাস হয়। সেই মতেই তার পথের শুরু, মত যেমন যেমন বাঁক নেয়, পথ-ও তেমন তেমন বাঁক নেয়। সেই পথ বেয়ে বিজ্ঞানীর এষণার একমুখী গতি-ই 'গবেষণা'।

অনন্ত বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির অন্তঃস্থল, এক এক মত নিয়ে এক এক পথে আসা, এক এক ভাবের বিজ্ঞানীর সম্মুখে, এক এক ভাবে উন্মোচিত হয়।

"যত মত তত পথ।"
যেমন মত তেমন পথ।
যেমন পথ, তার অন্তে তেমন রত্ন।
"যেমন ভাব তেমন লাভ।"

মত-পথ-ভাব-লাভ সব যেন কোনো এক সুরের সূত্রে গাঁথা।

এই সুরের মূর্ছনা যার বোধে অনুরণিত হয়, তিনি অন্য এক থাকের বিজ্ঞানী। তিনি ভাবের ঊর্দ্ধে উঠে অনুধাবন করেন, আপাত ভিন্ন ভাবসমূহ কোনো এক সুরের বাঁধনে শৃঙ্খলিত হয়েই প্রকৃতি রূপে সজ্জিত হয়ে আছে। প্রকৃতির মূলে গিয়ে তিনি দেখেন এই সুর-ই প্রকৃতি। প্রকৃতি-র ভাবধারা রূপে নয়, তিনি দেখেন - প্রকৃতি-ই ভাবধারা, ভাবের ধারা-ই প্রকৃতি; স্থূল-আলাপচারিতায় "প্রকৃতির নিয়ম" ব্যবহার হলেও, প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি-ই নিয়ম বা নিয়মের সুসজ্জিত শৃঙ্খল।

যিনি এরূপ দর্শন করেন, যার বোধে 'প্রকৃতি' নিয়মের শৃঙ্খল রূপে প্রতীত হয়, সে বোধের আধারে প্রকৃতি-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত কোনো এক সত্ত্বার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। অন্যভাবে বললে, ভাবের ধারা-ই যখন প্রকৃতি, তবে তা, কার ভাবের ধারা? 'প্রকৃতি'-টি প্রকৃতপক্ষে কার প্রকৃতি? 'রাধা' নিজেই তো 'ধারা'। সে ধারা কার?

যার রাধা, তাঁর-ই ধারা। রাধা যার প্রকৃতি, সেই প্রকৃত অর্থাৎ সত্য। সত্যের যা প্রকৃতি, তাই ধারা হয়ে প্রবাহিত। সাধারণ চেতনায় যে প্রকৃতি-বোধ, যে প্রকৃতিতে আমাদের বাস, আমরা প্রত্যেকে যে যে প্রকৃতির, তা সত্যের প্রকৃতি-র ই ধারা। সেই সত্য-টি সত্যি সত্যি কি? তাঁর স্বরূপ কি?

জিজ্ঞাসু যখন কোনো এক সত্ত্বা-কে জানতে ইচ্ছা করে, সে আপন প্রকৃতি নির্দেশিত পথে সেই সত্ত্বার প্রকৃতিরূপ-টি অন্বেষণ করে। সত্ত্বা-টি তাঁর প্রকৃতি রূপে ভেসে এসে, জিজ্ঞাসুর চেতনায় স্ফুরিত হতে থাকলে, বিজ্ঞানীর চিত্তপটে সত্ত্বাটির প্রকৃতি-র ধারণা হয়। সত্ত্বার প্রকৃতিই তখন জ্ঞানের আকার ধারণ করে জ্ঞাতার চিত্তে জ্ঞেয় হয়।

এখন জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা - যে সত্ত্বা আপন প্রকৃতি আশ্রয় করে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় - এই ত্রিপুটির সীমার অন্তরে আপনার সার-টি নিবদ্ধ করেছেন, সেই সত্ত্বার স্বরূপ-টি কি? ছন্দময়ী প্রকৃতি কাকে ছন্দোবদ্ধ করতে প্রয়াসী? কবির চিত্তে "নিতি নৃত্যে কে যে নাচে?" - তা জানার উপায় কি? সেই মূল সত্ত্বা জ্ঞেয়-রূপে জ্ঞাত হবে কোন জ্ঞানে?

জিজ্ঞাসু দেখেন, যে জ্ঞানের নক্সা জ্ঞেয়-কে জ্ঞাত-রূপে তুলে ধরে, প্রকৃতি নিজেই তো সেই জ্ঞান-নক্সা। যত বুদ্ধির কসরত, যত বিশ্লেষণ, যত প্রচেষ্টা - সেই নক্সার মধ্যেই, নক্সা মেনেই। দেখা, শোনা, বোঝা আর যত ক্রিয়া তা তো প্রকৃতির দ্বারাই কৃত! যা দেখি, যা শুনি, যা বুঝি তাও তো প্রকৃতিধারা।

আছি ফেঁসে, দেখি, প্রকৃতির রবে ।
প্রকৃত কি তবে অধরা রবে -
আড়ালে মুচকি হেসে রবে নীরবে?

কেমনে তবে মিটে মনের আশ,
হেঁয়ালি-তে যে মিটে না তিয়াস!

প্রকৃতির সব ধাপ পেরিয়ে এসে সত্যসন্ধানী আর প্রকৃতিতে মজে নেই। প্রকৃতির মূলে এসে সত্যসন্ধানীর ব্যাকুল জিজ্ঞাসা - প্রকৃতির মূলে কি?

সেই মুহূর্তে তার প্রকৃতি-নিস্পৃহ নিস্পন্দ চিত্তে সত্যের বিজলীচমক। তাতে উদ্ভাসিত হয় যে - যেখানে দাঁড়িয়ে তার ব্যকুল প্রশ্ন, সেখানেই সেই প্রশ্নের উত্তর। প্রকৃতির মূলে তো তিনি-ই দাঁড়িয়ে, আর খুঁজে চলেছেন প্রকৃতির মূলে কে আছে?

সত্য এত সহজ, এত সরল, এত আপন! বিস্ময়কর, অপূর্ব এক অনুভূতির শিহরণে রোমাঞ্চিত, বাক্-রূদ্ধ হয়ে তিনি আপনাকে বোধে বোধ করতে থাকেন। যে প্রকৃতিতে তিনি আছেন ও থাকেন, তার উৎস-সন্ধানে সে প্রকৃতিধারার প্রতিকূলতা অতিক্রম করে গোমূখে এসে দেখেন - এ ধারা তার আপনার-ই -'প্রকৃতি' তাঁরই প্রকৃতি। প্রকৃতির জট ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি উত্তরে পৌঁছে দেখলেন, তাঁর ধারা তাঁর-ই জটায় বদ্ধ ছিল। জটা উন্মুক্ত করে তিনি-ই আপন ধারায় প্রবাহিত হয়ে, সে ধারায় আপনাকে-ই ভিন্ন ভিন্ন রূপে বদ্ধ করে রেখেছেন। এই সরল সত্য-টি কে আপন প্রকৃতিতরঙ্গের বক্রতায় দূর্বোদ্ধ করে রেখেছেন।

প্রকৃতিতে যা কিছু, তার কেন্দ্রে তিনি-ই। সর্বঘটে তিনি-ই ঘটছেন। এক এক ঘটে আপনাকে এক এক নতুন রূপে জেনে তার আনন্দ।

এই বোধে-ই তার মুক্তি।

হৃদয়ের তন্ত্রীতে তাঁর বাজতে থাকে -
সোহহম্, সোহহম্।
আমি-ই সেই - যে প্রকৃতির মূলে।
প্রবাহ রূপে আমি-ই প্রবাহিত।
এই প্রকৃতি আমার-ই প্রকৃতি।
তার মূলে আমি-ই সেই।

দেশলাই

দেবাদৃতা রায়
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

ছোট্ট একটু ঘরের মধ্যে
ওরা সবাই বন্দি।
নেই মাথায় বুদ্ধি সুদ্ধি
নেই পালানোর ফন্দি।
কাঠির মত শীর্ণ শরীর
মাথায় গোবর পোরা
মরবে যখন, মরবে তখন,
মাথা ঠুকে ঠুকে মরা।
সভ্যতার ইতিহাসে
ওরাই প্রথম ধাপ।
রেগে গেলেই মাথায় আগুন
নেই যে কোন মাফ।
কাঠির মতন ছোট্ট শরীর!
দারুণ ক্ষমতা ধরে।
রেগে গেলেই বিশ্ব ভূবন,
সব ছারখার করে।
মঙ্গল দ্বীপ ওরাই জ্বালায়
নিজেদের শেষ করে
অমঙ্গলের অগ্নি শিখা
জ্বালায় তেমনই করে।
জন্মদিনের শুভায়ুর তরে
ওরা জ্বালায় মোম্‌বাতি
মহা মৃত্যুর যবনিকায়
ওরাই তো হয় সাথী!
জ্বালায় ওরা রঙিন আলো,
দীপাবলীর রশ্‌নাই
সবার জানা সবার চেনা
প্রয়োজনীয় দে-শ-লা-ই।

মা

কৃষ্ণা তেওয়ারী
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

তখন সবে সকাল ছয়টা বাজে। মীনা ঘুম থেকে উঠেছে মাত্র কয়েক মিনিট আগেই। হঠাৎ বেজে উঠল তার মোবাইলটা। মামার ফোন। ছ্যাঁত করে উঠল মীনার বুকের ভিতরটা।

"হ্যালো" মীনা মোবাইল রিসিভ করে বলল।

ওপার থেকে মামার গলা- "হ্যালো মীনা। তোর মা বাথরুমে পড়ে গেছে। চোট ভালোই লেগেছে। মাথা ফেটে গেছে। অনেক রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা ওকে কাছাকাছি একটা নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছি। তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস চলে আয়।" ফোনটা কেটে গেল।

'মা বাথরুমে পড়ে গেছে!' মীনা শুধু যেন এই কথাটাই শুনতে পেয়েছে। আর কিছু সে শুনতে পায়নি। 'কি করে এমন হলো? এখন কি করবো?' হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে মীনা তার স্বামী রাজেশকে ঘুম থেকে ঠেলে তোলে। ঘুমভাঙা চোখ নিয়ে রাজেশ উঠে বসে। মীনা পাগলের মত শুধু বলতে থাকে "মা বাথরুমে পড়ে গেছে! মাথায় চোট লেগেছে! আমাকে যেতে হবে তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!"

যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি হয়ে মীনা ও রাজেশ বেড়িয়ে পড়ে নার্সিংহোমের উদ্দেশ্যে। তাদের দেড় বছরের ছেলেকে রেখে যায় আয়ার কাছে।

গাড়িতে যেতে যেতে মীনা মায়ের কথা ভাবতে থাকে। ওরা দুই-ভাই বোন। দাদা থাকে আমেরিকায়। ওখানেই সেটেল্ড। আর মীনার বিয়ে হয়েছে। ও নিজের স্বামীর সঙ্গে দিল্লির রাজেন্দ্রনগরে থাকে। মীনার ফ্ল্যাট থেকে ওর মায়ের ফ্ল্যাট অনেকটাই দূরে। তবুও মীনা প্রায় রোজই যেত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বাবা মারা যাওয়ার পর ফ্ল্যাটে মা একাই থাকে, সঙ্গে একজন পরিচারিকা থাকে মায়ের দেখাশোনার জন্য।

মীনার মামার ফ্ল্যাট ছিল মায়ের ফ্ল্যাটের কাছাকাছি। একেবারে সামনে। সেখানে মামা নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকতেন।

আধ ঘন্টার মধ্যেই মীনা ও রাজেশ পৌঁছে গেল নার্সিংহোমে। নার্সিংহোমের ভেতরে ঢুকতেই মামাতো ভাই দীপের সঙ্গে দেখা। দীপ ওদের নিয়ে গেল ICU রুমের বাইরে, যেখানে মামা একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। মীনা ও রাজেশকে দেখে মামা উঠে দাঁড়ালেন। মীনা ছুটে এসে মামার দুহাত ধরে প্রশ্ন করল- "মা কোথায়? মা এখন কেমন আছে মামা?" মামা বললেন- "ডাক্তার তো ওকে ICU-এর ভিতরে নিয়ে গেছেন। তবে এখনই কিছু বলতে পারছেন না। জ্ঞান নেই। অনেক রক্তক্ষরণও হয়েছে। কি জানি কি হয়!"

ওরা চারজন ICU-র বাইরে চুপ করে বসে অপেক্ষা করছে। মীনার মনের ভেতর যে কি তোলপাড় হচ্ছে তা সে শুধু নিজেই জানে আর জানে তার ঈশ্বর। মীনার জন্য তার পৃথিবী ছিল শুধু বাবা আর মা। বাবা-মা ছাড়া সে কিছু জানতো না। বাবার মৃত্যুর পর সে খুব ভেঙে পড়েছিল। তখন মা তার পাশে ছিল। তাকে নিরন্তর সাহস দিয়ে স্বাভাবিক হতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু আজ? মায়ের যদি কিছু হয়ে যায়- তখন কে থাকবে তার পাশে?

মীনা কান্নায় ভেঙে পড়ে। হঠাৎ সেই সময়ে ডাক্তার বাইরে আসেন। মীনা ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে। জানতে চায় তার মায়ের অবস্থা। ডাক্তার জানান- "রোগীর অবস্থা এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে রক্তক্ষরণ হওয়ার জন্য দু-বোতল রক্ত এখনই লাগবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জোগাড় করুন।" রাজেশ ও দীপ রক্ত জোগাড়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মীনা তাদের বলে- "ব্যস্ত হয়ো না, আমি মাকে রক্ত দেব।" ডাক্তার মীনাকে জিজ্ঞেস করে, "আপনার রক্ত গ্রুপ কি আপনি জানেন?" মীনা বলে, "হ্যাঁ, A+(পজিটিভ)।" ডাক্তার বলেন, "না, আপনার মায়ের ব্লাড গ্রুপ B+(পজিটিভ)। তাই আপনার রক্ত তাঁকে দেওয়া যাবে না। দেখুন, B+ রক্ত জোগাড় করুন, যত শীঘ্রই সম্ভব।"

দীপ বলে ওঠে- "ডক্টর, আমার গ্রুপ B+(পজিটিভ), আমি পিসিমণিকে ব্লাড দেবো।"

ডাক্তার বলেন, "আসুন।"

দীপ ডাক্তারের সঙ্গে ভেতরে চলে যায়।

মীনা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তারের কথা সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে মায়ের ব্লাড গ্রুপ A+ নয়। এটা কি করে সম্ভব? ওর মনে পড়ে অনেক বছর আগে যখন মীনা কলেজে পড়তো, বাবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। তখন বাবাকে রক্ত দিতে ওরা দুই ভাই-বোন হাজির হয়েছিল ডাক্তারের কাছে। দুজনের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করেছিলেন ডাক্তার। দাদার ব্লাড গ্রুপ O+(পজিটিভ) আর মীনার ব্লাড গ্রুপ A+(পজিটিভ)। বাবার ব্লাড গ্রুপ ছিল O+(পজিটিভ)। দাদা মজা করে বলেছিল, "আমি বাবার ছেলে!" তখন মীনাও বলেছিল, "তাহলে আমি মায়ের মেয়ে!"

মীনার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মায়ের ব্লাড গ্রুপ A+, কারণ মেডিকেল সাইন্স বলে ছেলে মেয়ের ব্লাড গ্রুপ বাবা-মা কারো একজনের সঙ্গে মিলবে। কিন্তু মায়ের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করার প্রয়োজন কোনদিন পড়েনি।

কিন্তু আজ মেডিকেল সাইন্স কে মিথ্যা প্রমাণ করে মায়ের ব্লাড গ্রুপ B+ হয় কি করে? হাজারো প্রশ্ন মীনার মনে। কিন্তু উত্তর দেবে কে? যার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর আছে সে তো ICU তে জীবন মরণের লড়াই লড়ছে। তবে? কে দেবে উত্তর? কে বলবে মীনাকে কেন এমন হলো? বাবা রক্ত O+, মায়ের রক্ত B+ আর মীনার রক্ত A+?

মীনা মামার দিকে তাকায়। মামা এতক্ষণ মীনার দিকেই চেয়ে ছিলেন। কিন্তু মীনা তার দিকে তাকাতেই তিনি অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। মীনা সোজা এসে মামার সামনে দাঁড়ায়।

"মামা" সে কিছু একটা বলতে চাইল মামাকে। মামা হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলেন। মামা রাজেশের দিকে ফিরে বললেন- "বাবা রাজেশ! সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। একটু চা-টায়ের ব্যবস্থা যদি করা যায় দেখনা।"

"হ্যাঁ মামাবাবু! আমি এখনই আনছি।" বলে রাজেশ বাইরে গেল।

মীনা এবার মামাকে চেপে ধরল।

"মামা! আমি কি মা-বাবার নিজের সন্তান নই? তা না হলে এমনটা হয় কি করে? বল না মামা? তুমি জানো সত্যিটা তাই না?"

"থাক না মীনা। কিছু কথা না জানাই ভালো মা। তাতে সবাই ভালো থাকে। আবার অনেক সময় সত্যিটা জীবন ওলট-পালট করে দেয়। তাই আর পুরনো কবর খুঁড়িস না মা।"

"না মামা। সত্যিটা আমাকে জানতেই হবে। সেটা যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক। সত্যিটা তুমি আমাকে বল!"

"ঠিক আছে, বলছি। কিন্তু তার আগে তুই আমাকে কথা দে যে এইসব কথা শুধু তোর আর আমার মধ্যে থাকবে। রাজেশ যেন এসব কথা কোনদিন না জানে। নইলে তোর জীবনটা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে মা। কথা দে কাউকে বলবিনা!"

"ঠিক আছে মামা। কাউকে কিছু বলব না। তুমি বলো।"

"তবে শোন.. আমার দিদি রমা আর জামাইবাবু শ্রীকান্ত দিল্লির

চাঁদনীচৌক এলাকায় থাকতেন। ওদের পরিবার দিল্লির পুরনো বাসিন্দা হলেও যখন যখন দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হত, দিদি-জামাইবাবু পালিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে চলে আসত। আবার পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ হলে ফিরে যেত নিজেদের ঘরে। বহুবার এরকম হয়েছে। আমার বাবা জামাইবাবু শ্রীকান্তকে আমাদের এলাকাতেই ফ্ল্যাট কিনতে পরামর্শ দেন।

একবারের কথা, রমা দিদির কোলে তখন তোর দাদা বিশাল এসেছে। বিশালের বয়স হবে বছর দুই। আবার সাম্প্রদায়িক আগুনে তপ্ত হতে থাকল দিল্লি। কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় আমি দিদি-জামাইবাবু ও ভাগ্নেকে আনতে তাদের বাড়ি গেছি। ঘরদোর ভাল করে বন্ধ করে তাদের গাড়িতে নিয়ে ফিরছি, এমন সময় রাস্তায় দাঙ্গা লেগে যাওয়ার খবর শুনলাম। দেখলাম রাস্তার মানুষজন যেদিকে পারছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটে পালাচ্ছে। আমিও খুব স্পিডে গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছি। সবসময় আমাদের মনে একটা আতঙ্ক কাজ করছিল। পালাতে-পালাতে কোন এলাকায় এসে পড়েছি কিছুই হুঁশ ছিল না। হঠাৎ আমার গাড়ির সামনে এসে পড়ল এক মুসলিম মহিলা। আহত, রক্ত ঝরছে কপাল দিয়ে। কোলে একটি এক বছরের শিশুকন্যা। কাঁদছে জোরে জোরে। তাকে বাঁচাতেই মায়ের আকুল-মিনতি, "মদত কিজিয়ে ভাইজান! বচ্চি কো বচাইয়ে বহন জি!"

কিছু দূরে এক দল দাঙ্গাবাজ লোক হইহই করে তেড়ে আসছে। তাদের হাতে লাঠি-অস্ত্র। কি করব ভাবতে পারছিনা এমন সময় দিদি হঠাৎ দরজা খুলে নিমেষের মধ্যে ওই মহিলার কোল থেকে বাচ্চা মেয়েটাকে চট করে নিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। ওকে কোলে চাদরের তলায় লুকিয়ে নিজের বুকের দুধ ওর মুখে গুঁজে দিল। বাচ্চাটিও মায়ের দুধ মনে করে কান্না থামিয়ে পান করতে থাকল জীবন সুধা। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিদ্যুৎ গতিতে ঘটে গেল এ ঘটনা। দাঙ্গাবাজরা ততক্ষণে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। আমি আর কিছু না ভেবে হাইস্পিডে সামনে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। দিদি পিছু ফিরে দেখেছিল দাঙ্গাবাজরা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারছে ওই মহিলাকে। ওই মহিলাকে বাঁচাতে না পারার আফশোস আমাদের সবার মনকে ভারাক্রান্ত করে দিল। কিন্তু পরিস্থিতিটাই এমন ছিল, আমাদের কিছু করার ছিল না।

আমরা বাড়ি পৌঁছালাম যখন তখন অনেক রাত। বাড়িতে গিয়ে আমরা সমস্ত ঘটনা আমার বাবা-মাকে বললাম। আমার তখনও বিয়ে হয়নি। তাই আমরা চারজন ছাড়া আর কেউ জানলো না একথা। সবাই ক্লান্ত, যে ঝড় বয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে তা সবারই শরীর ও মনে দাগ কেটে গেছে। আমরা বিশ্রাম নিতে গেলাম। সেই ছোট মেয়েটিকে দিদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিজের কোলের কাছে নিয়ে শোয়ালো। বাচ্চাটিও তাকে নিজের মায়ের কোল মনে করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রইলো।

সকাল বেলায় চা-টা খাওয়ার পর আমরা আলোচনায় বসলাম, বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে কি করা যায়? ও যে মুসলিম মেয়ে তাতো আমরা জানি। আমার মা বললো ওকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে আসতে। কিন্তু আমার দিদি-জামাইবাবু কিছুতেই রাজি হলেন না। ওরা ঐ বাচ্চা মেয়েটিকে নিজের সন্তানের মতো প্রতি পালন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনেক কথার পর ঠিক হলো মেয়েটির আসল পরিচয় কাউকে বলা হবে না। ও আজ থেকে দিদি-জামাইবাবুর মেয়ের পরিচয় বড় হবে। তারপর জামাইবাবুও আমাদের পাড়াতেই ফ্ল্যাট কিনতে রাজি হয়ে গেলেন। পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ হতেই জামাইবাবু নিজের বাড়ি ফিরে গিয়ে বাড়িঘর বিক্রি করে দিলেন। তারপর আমাদের পাড়াতেই ফ্ল্যাট কিনেই পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করলেন। পাড়ার বাসিন্দারা যদিও কেউ অন্যের খবর খুব একটা রাখত না, তবুও সবাই এটাই জানল এবং এখনও জানে, আমার দিদির দুই সন্তান-ছেলে বিশাল আর মেয়ে মীনা।

তোর মা যখন তোকে পেয়েছিল তখন তোর গলায় একটা রূপোর হার ছিল, যাতে একটা তাবিজ লকেটের মত করে লাগানো ছিল। সেই তাবিজের গায়েব উর্দুতে কিছু লেখা ছিল যা আমরা পড়তে পারছিলাম না। কিছুদিন পর একদিন আমি ওই হারটি নিয়ে গিয়ে আমাদের টেলার মাস্টারকে দেখাই এবং জিজ্ঞেস করি এতে কি লেখা আছে? টেলার মাস্টার ওটি দেখে বলেন- "এটিতে 'আমিনা' লেখা আছে। কোথায় পেলেন এটা?" আমি বললাম কুড়িয়ে পেয়েছি।

তোর আপন মা হয়তো তোর নাম "আমিনা" রেখেছিলেন। তাই তোর প্রতিপালিত মা তোর নাম রাখলেন "মীনা"। এবার বুঝলি কেন তোর ব্লাড গ্রুপ A+ আর তোর মায়ের B+"।

মীনা হাঁ করে শুনছিল আর চোখ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল অশ্রুধারা। আজ সে সত্যি ধন্য এমন একজন মায়ের মেয়ে হয়ে যে প্রমাণ করে দিয়েছে যে মায়ের কোন জাত হয়না, মায়ের কোন ধর্ম হয় না, মা শুধু "মা" হয়। কারণ সে মাতৃজাতি আর সেই ভালোবাসাই তার একমাত্র ধর্ম!

Chaotic Inspiration

Sutirtha Paul
(1st year, 2021-2023)

The sky was a brilliant blue with patches of fluffy white clouds. Golden wheat fields stretched out on both sides of the gravel road, occasionally dotted with clumps of olive trees or the odd cypress. Farmhouses with red roofs could sometimes be made out in the distance. It looked like a summer landscape out of an Impressionist painting and provided a fine contrast to the wooden benches and chalkboards I had been staring at for what now seems like an eternity. It had been close to an hour since we had left the city centre and by the driver's estimate, our destination wasn't far off.

I had been locked in a stubborn battle with a research problem over the past half a year and seeing my condition, Peterson from Biology quite generously offered me his family's summer house which would have otherwise remained empty for a 'change of scenery' and a place to find inspiration. So I packed my bags and jumped on a plane as soon as I had managed to delegate my semester-end duties to some other poor sap.

The scenery outside had changed from wheat fields to houses. They were mostly one or two-storey houses built not adhering to any particular architectural style but surrounded with well-kept gardens. We were driving through the village now. The houses gave way to green unkempt grasslands and soon I could see the large summer house towering over the landscape. We turned right onto the driveway and stopped in front of the doors. As the car began backing out of the driveway, I stood there, backpack in hand looking at the house. It was a large house, brick red in colour and a fine example of revivalist architecture. Portions of the right wing had fallen in a state of disrepair but the house remained a nostalgic ode to the former glory of Europe. I rang the doorbell and was let in by the housekeeper, Mrs. Latham. A chief attraction of the house was the large collection of books and other scientific instruments kept there. The last permanent resident, one of the former patriarchs of the family had worked as an engineer during the war and had greatly expanded the already existing collection. Two rooms at the back of the house stored the collection, the ground floor housed classics of literature while the first floor housed scientific books. The first floor also contained a collection of mechanical instruments, old microscopes and telescopes in a glass case on one side. Neatly labelled and clearly displayed in excellent condition it was clear that this collection had been an object of fondness for the owner.

.....

After a hearty dinner, I took some paper and pen and went up to the first floor of the library. During my morning tour of the house, this had seemed like an ideal place to work. A couple of youths in the village had spun a tale of the library being haunted by a thin man with silvery hair and piercing eyes but my housekeeper had dismissed them outright. The room was spacious with large bay windows on one side overlooking the greenery at the back of the house. A large table and chair were kept in front of them. This is where I settled down and finally got to work.

An hour later having exhausted two sheets of paper without making any progress, I got up and walked about for inspiration. The books were arranged chronologically and covered a wide range of times and topics ranging from Galileo's Mechanics and Bacon's Advancement of learning to Einstein's collected works. Presumably, that was when the patriarch got too old or passed away. I gathered a copy of Galileo's The Assayer and Newton's Principia and sat down. Galileo's book was remarkable. It laid down the scientific method and criticised contemporary Jesuit mathematician Grassi. This is also where his famous statement - "Mathematics is the language of science," comes from.

"How long do you think before he notices us?"

I immediately turned around and saw a well-built man of average height with piercing eyes and a flowing silver beard looking at me. It was Galileo – in the flesh.
"Why are you looking at me like that for? You must've seen my picture many times before."

"Well, you're supposed to be dead for 400 years now."

"I am dead, of course."

"So am I dreaming?"

"You think you're talking in your sleep?"

"Are you the ghost that the kids were talking about haunting the library?

"Of course not, do I even look scary? No, that was Newton, those fools had opened
Principia first. Oh, Isaac! Just as much of a _____ in death as in life.

And with those words, Galileo picked up the Principia and chucked it out of the open window.

"How do you even know about that? You died before he was born."

"I have friends of course."

Galileo picked up a book from the shelf and flipped it open.

"I hope Newton isn't around anywhere."
"No, no we've taken care of that."

From the behind, the bookshelf on the right strode a portly man, clean-shaven but with
hair which extended beyond his shoulders. Quite unmistakebly – Gottfried Leibnitz.

"Ahh, what a joy to be about without that _____ spoiling the mood."

"Well for that, we must thank this gentleman over here, who thankfully opened my
book first."

"Thank you most kindly, dear sir. Pray what may be you doing here?"

"Well, I'm a physicist and I'm trying to - "

"A physicist eh! Well, what sort of Physics are you doing sitting at a desk in the middle of the night, without any instruments. Are you writing a book?"

"Well, no I'm trying to write the Hamiltonian -"

"Hamiltonian? Does this have something to do with that Irishman who lives on that shelf over there? We don't get along with those guys. They're too confused. I tell you what? We should have a nice little party here. Normally I'd like to hear about your work but you must realise that it's very cramped and boring sitting on the shelf for years on end. Come on Gottfried, I'll get Brahe and Flamsteed you get Huygens and whoever else you want."

"Come on Galileo, just think about the last time we had a party. I don't think it's a good idea -"

"Of course it's a good idea, we'll just restrict it to ourselves and not let any of those lost souls and Jesuits in."

Meanwhile having been unable to get any word in edgeways I had resigned me to sitting on the chair and watching the events unfold as it is. Even if this was in my head, clearly I was not in control.

....

The library had begun to represent an eighteenth-century salon, although instead of being hosted by the customary high lady of society it was being hosted by Galileo himself. A very lively discussion on astronomy had begun among Galileo, Kepler, Brahe, Flamsteed, Hevelius and Horrocks. Horrocks was explaining in detail how he had predicted the transit of Venus. I had tried to follow but given my own tenuous grasp on modern experimental methods, there was no hope of understanding seventeenth-century ones either. Von Leuwonhoek and Hooke along with other Biologists whom I did not recognise were rather enthusiastically examining a nineteenth-century microscope. The mathematicians, Leibniz, Pascal, Fermat and Bernoulli was engrossed in their own discussion when suddenly Galileo's voice boomed out -

"Who let him out?"

I saw Galileo looking at a thin man with sunken eyes dressed in priest robes.

"That would be me. His books were massively influential to me. I always wanted to meet him," Huygens said.
"I'll show that Jesuit today. All that nonsense they came up with and history only remembers the shame."

I realised it was Christopher Scheiner, a modest astronomer who had been engaged with a priority dispute with Galileo over the observation of sunspots. He was also a Jesuit, people who Galileo considered responsible for losing the trial. Galileo meanwhile in his enthusiasm had strolled over to the shelf with 18th-century books and opened one.

William Herschel appeared beside the table.
"Tell him, Will, what people think of the geocentrism nonsense in your time."

"Ah, finally. I've already told you before Galileo, heliocentrism is widely accepted now. Now, where are Catherine and South?"

By now, Leibniz had become engaged in an argument with a short man with a sharp nose and sunken cheeks, who I later learned was Fatio, one of the people who had taken Newton's side and accused Leibniz of plagiarism. Fatio too had been brought in by Huygens. To bolster his argument Leibniz saught out Lagrange. Herschell meanwhile brought in his sister Caroline and fellow astronomer James South.

...

It soon becomes completely chaotic. Each new scientist had brought in his own friends as a result of which the library was now packed with scientists from different centuries. Everybody seemed to have formed their own cliques and argued with each other bringing up unfinished material from past parties. I had long been evicted from my chair and was now standing in front of the window with Einstein and Ehrenfest for company.

"Does this happen often?", I turned around and asked Ehrenfest.

"Not often, it's rare for people to come here and open the old books. But yes, whenever we have parties they end like this."

"They are all humans you know – behind the equations and theories which simply bear their name they are complex characters. In science, we focus on their work and not on the people and rightly so but the people were just as fascinating. There have been many many people in history who were instrumental in overcoming the obstacles and paved the way the for us but have now been relegated to historical research. Some of us are lucky, our books are well-read-we live on through our books as you can see.

"So all this is real? It's not in my head?"

"Of course it's in your head. Why do you think everybody's speaking modern English? But just because it's in your head does not mean it's not real."

"Look out," a voice boomed across the library. But it was too late, I was only just in time to make out the blur of a book before it made contact with my head.

.....

I woke up to a very annoyed looking Mrs. Latham standing over me with a breakfast tray. I looked around – there was no trace at all of last night's (party). All the books were back in their shelves and the Assayer lay open beside me.

I incredulously took the tray from her hands and began eating slowly while looking around. What a vivid dream, the journey yesterday combined with the pleasant climate must have contributed. I finished my breakfast and went out for a walk. The woods which had looked foreboding in the moonlight yesterday from the library seemed very welcoming. The sky looked just as blue as yesterday with silvery whisps of cloud making their occasional appearance. And then I saw it. Just under the bay windows of the library, laying perfectly still on the grass was a copy of the Principia.

Artwork: Mariom Mamtaj
(1st year, 2021-2023)

গায়ের রং

রাজেশ জানা
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

গায়ের রংটি বেজায় কালো
কিন্তু গুণ ছিল বেশ ভালো
বাবা-মা এর রাজকন্যা
ঘর করে রাখত আলো।

জন্মের পর থেকেই মেয়েটি ছিল কালো। বাবা-মা-এর কাছে রাজকুমারী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের চোখে সে ছিল কুৎসিত। সমাজে হেয়ালির অভাব ছিল না, কেউ কেউ হেয়ালি করে বলত কৃষ্ণকলি। ছোটোবেলা থেকেই মেয়েটির পড়াশোনার প্রতি প্রচুর উৎসাহ ছিল তার পাশে ছিল ছবি আঁকা। এইভাবে দিনের পর দিন মেয়েটি যতই বড় হতে লাগল ততই প্রতিবেশীদের নাক তোলাটা বাড়তে লাগল। উঠতে বসতে কটুকথার শিকার হতে হয়। মেয়েটির ইচ্ছে ছিল বাবা মায়ের পাশে দাঁড়ানো, সমাজের অবহেলিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু মেয়ে বড়ো হওয়াতে বাবা মা-এর চিন্তা বাড়তে থাকে এবং বিয়ের জন্য পাত্র দেখতে থাকে। কিন্তু মেয়েটির গায়ের রং কালো হওয়ায় কেউই তাকে পছন্দ করে না। তাছাড়া একজন তো বলেই দিল যে কালো মেয়েকে নিয়ে আমি বাইরেই বেরোতে পারব না। কেউই তার গুণের কদর করে না। এমন পরিস্থিতিতে মেয়েটির ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও তাকে পাত্রপক্ষের সামনে বসতে হত ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হত। ধীরে ধীরে মেয়েটি নিজের মনকে শক্ত করে, পড়াশোনা চালিয়ে যায় এবং তার মনের কষ্টগুলিকে এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে ছবির মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত করে। কিছুবছর পরে মেয়েটি অনেক অধ্যাবসায়ের পর একটি চাকরি পায়। তারপর সে একটি সমাজকল্যাণমূলক কাজে যোগ দেয় যেখানে তার রূপ না দেখে, গুণ দেখে। সেখানে মেয়েটির অনেক বন্ধু হতে থাকে, অনেকে মিলে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। দেখতে দেখতে বছরের শেষে প্রতিষ্ঠানটি বড়ো হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি অনেক অসহায় মানুষদের সহায়তা করে।

আজ সেই প্রতিষ্ঠা দিনে কালো মেয়েটিকে দেখতে হাজারো মানুষের ভিড়। সেখানেই এক পাত্রের বাবা সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ব্যাক্তিটি কিছুক্ষণ ধরে মনে করার চেষ্টা করছিল পরে বুঝতে পারল। সেই সময় এক ব্যাক্তি মেয়েটির কাঁধ স্পর্শ করল, তিনি ছিলেন তার স্বামী, দেখতে শুনতেও বেশ ভালো। তবে যাওয়ার আগে তার স্বামী ভদ্রলোকটিকে বললেন "পার্থক্য গায়ের রং-এ হয়না, হয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে, সুন্দর মানে শুধু শারীরিক সৌন্দর্য নয় , সুন্দরতা থাকে মনের মধ্যে। সবকিছু নিয়ে যে নিজেকে ভালোবাসতে পারে এবং অন্যকেও ভালোবাসতে পারে, সেইতো আসল সুন্দর।" এই বলে দুজনে হাত ধরে চলতে থাকল। আজ ওরা কত খুশী এবং মা-বাবাও খুব খুশী।

যে যেমন সে তেমন
খোঁজে সুখের সাথী
রূপ বদলালেও মনের বদল
হয়না রাতারাতি।

অনির্বাণ

ভাস্কর মন্ডল
(প্রথম বর্ষ, ২০২১-২৩)

মিশে যাও তুমি-
গভীর রাতের
প্রাণোচ্ছল বেদনায়।
ধমনীতে বয়ে চলা রক্তের
অবঞ্চিত শাসন
মুছিয়ে দাও তুমি –
তোমার আগমনের শিহরণে।
প্রস্তরখন্ডের ভাঙা গড়ার মাঝে
জীবন্ত আগুনের কাঁপা কাঁপা হাত
আবৃত করে রাখে আমার কলুষিত প্রাণকে,
আর তখনই আমি দেখি তোমায়–
শত শত আলোকবর্ষের দূরের
কোনো এক বিশ্বে
বয়ে চলা জীবনের স্রোতে দেখি তোমায়,
কোনো এক নিবেদিত প্রাণের
চেতনায় দেখি তোমায়,
কৃষ্ণগহ্বরের হারিয়ে যাওয়া রাস্তার
বাঁকে দেখি তোমায়।
এই বিশ্বে আর সেই বিশ্বের মাঝে
আলোকবর্ষের পরিধি আমার অজানাই–
শুধু খুব চেনা কোনো মুখের আদল
দেখা যায় তোমার মুখে –
অস্পষ্টতা ও আবছায়ার অন্ধকারে
আমি দেখি তোমায়
আর তোমার অনুনাদ
গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে ॥

নিসঙ্গী

সুবীর মান্না
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

সময়টা গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে হবে। সকাল থেকে আকাশে একটা অনাকাঙ্খিত চাপা মেঘের উপস্থিতি শীতের হাড় হিমতাকে কিছুটা দমিয়ে রেখেছে। তবে বৃষ্টি হয় নি।

এমনই এক সন্ধেবেলা জ্বলে উঠেছে কাঞ্চন দার চায়ের দোকানের উনুন, ক্রমশ জমে উঠেছে দোকানের পাশাপাশি আড্ডা গুলো। কাঞ্চনদা শান্ত স্বভাবের মানুষ, বেশ ধীরে সুস্থে কথা বলেন। ছোটোবেলা থেকে সাহিত্যের প্রতি ওনার ভীষণ ঝোঁক। তার চায়ের দোকানের টেবিলের নিচে রাখা বেশ কয়েকটি গল্পের বই ও উপন্যাস, দুপুরে খদ্দের না থাকলে ওই অবসরে এইসব পড়ে সময় কাটান। আমাদের শহর মেদিনী। রঞ্জন, আমি আর সুচেতন সেই কলেজকালের বন্ধু। পুরোনো অভ্যেসের বশে আমাদেরও প্রতিদিনককার সন্ধেবেলাটা এই কাঞ্চনদার দোকানেই কাটে। সেদিন হঠাৎ কথা হচ্ছিলো, সামনের জানুয়ারিতে এই ব্যস্ততা ভরা শহরের বাইরে কোথাও বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? অবশেষে ঠিক হলো সুচেতনের বাড়ি থেকে প্রায় মাইল ষাটেক দূরের একটা গ্রাম 'মহুয়ার দেশ', ওখানেই যাওয়া হবে। সুচেতনের মুখ থেকে বিবরণ শুনে জায়গাটা সম্পর্কে যে কল্পিত রূপ পেলাম, তা বেশ ভালো লাগলো।

খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, আমাদের স্টেশন মেদিনী থেকে ভোর সাড়ে চারটায় রূপপুর লোকাল ধরে প্রায় ঘন্টা তিনেকের পথ, নামতে হবে মাদীরা স্টেশনে। সেখান থেকে মাইল তিনেকের হাঁটা পথ, তারপর মহুয়ার দেশ। আমরা যে বাংলোতে থাকব, তার নাম হল মহুয়া কটেজ।

কথামতো পরের মাসের তিন তারিখ, ভোর চারটে দশ নাগাদ আমরা সকলেই পৌঁছে গেলাম মেদিনী স্টেশনে। রঞ্জনের কাঁধে কালো ফিতে দিয়ে ঝোলানো ক্যামেরাটাকে দেখে খুব খুশি হলাম যে, মহুয়ার দেশে স্মৃতিকথাগুলোর কিছু বাস্তব পটচিত্র থেকে যাবে আমাদের সাথে। শীতের হাড়হিম ঠান্ডা যেন সমগ্র স্টেশন চত্বরটিকেজনমানবহীন করে রেখেছে। গার্ডের হুইসেলের শব্দে আমাদের যাত্রা শুরু রূপপুরের দিকে। ভোরের ঠান্ডা হাওয়া যেন স্থির করে রেখেছে আমাদের তিনজনকে, নড়াচড়া প্রায় বন্ধ। কিছুক্ষণ পর ভোরের আলো ফুটতেই দেখা যায় জানলার পাশে ছোটো ছোটো টিলার মাথা গুলো উঁচু হয়ে আছে। এইভাবে যাত্রাপথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম মাদীরা স্টেশনে। স্টেশনে নেমে একটু অবাক হলাম এই দেখে যে স্টেশনচত্বর সম্পূর্ণ জনশূন্য, কাছাকাছি কোনো জনবসতি নেই, এমনকি স্টেশনমাস্টারও নেই। রোদ ঝলমলে এই সকালের বেশ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবেই কেটে গেল জনশূন্য মদীরা স্টেশনে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একজন মাঝবয়সী মহিলা পিঠে ও কোমরে কতগুলি কাপড়ের পুঁটলি বেঁধে খর খর গতিতে হেঁটে আসছে, কাছে আসলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় "এই লাল মাটির রাস্তা ধরে প্রায় মাইল তিনেক হাটলেই মহুয়ার দেশ, ও মহুয়া কটেজ"। সকালের মাদীরার দু-একটা নৈসর্গিক দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করে আমরা হাঁটা শুরু করলাম লাল মাটির রাস্তা ধরে। কিছুদূর যাওয়ার পর চোখে পড়ে রক্ত পলাশ আর মহুয়া গাছের চোখ ধাঁধানো অপরূপ সৌন্দর্য। এইসব দেখতে দেখতেই আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্য মহুয়া কটেজ।

কটেজের ম্যানেজার সুনয়ন বাবু ভারী রসিক মানুষ, কথা ও সময় যেন ওনার মুখের কথায় চলে। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর ওনার মুখে এই জঙ্গলের নানান রহস্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা শোনার পর নিজেদের অজান্তেই আমাদের মনে জঙ্গল ভ্রমণের উৎসাহ অনেকগুণ বেড়ে যায়। ম্যানেজারের সাথে কথা শেষ করে তিনজনেই বেড়িয়ে পড়ি জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। জঙ্গলের রাস্তা লাল মাটির, মাঝে মাঝে প্রকান্ড প্রকান্ড গাছের উপস্থিতি কোনো কোনো জায়গাকে একটা ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের রূপ দিয়েছে। হেথা হোথা লাল মাটির ঢিপী, যেগুলো ঢাকা পড়েছে মহুয়ার ফুলে। চারিদিকে মহুয়া ফুলের গন্ধ যেন গ্রাস করেছে সমগ্র পরিবেশটাকে। শীতের বেলা খুব ছোটো, ফিরতে ফিরতেই সন্ধ্যে নেমে এসেছে। পরিবেশটাও ক্রমশ ছমছমে হয়ে উঠছিল। হঠাৎ পিছন থেকে কানে এল একটা ঝুমঝুম শব্দ। একটু পরেই দেখতে পেলাম একটা আঠারো-কুড়ি বছরের যুবতী মেয়ে হাতে একটা ঝুড়ি নিয়ে আমাদের দিকেই আসছে। আরেকটু কাছে আসতেই আমরা দেখলাম তার গায়ে একটা লাল হলুদের শাড়ি, হরিণীর মতন ডাগর ডাগর চোখ, কোমড় অবধি একগাছা চুল, বাঁকা খোঁপায় একটা ঘেটু ফুলের ঝোঁকা - সব মিলে আমাদের মনে হল যেন মেয়েটার এই মহুয়ার দেশের রূপকথার পরী। রূপের লাবণ্য উজার করে যেন সাজিয়ে দিয়েছে স্বয়ং প্রকৃতি পরমা। হঠাৎ আমাদের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসি হেসে সে বলে উঠল- "বাবুরা দাড়াইলেন ক্যান, বেলা যায়, ছায়া বারে, পথ যে অনেক বাকি"। ওর কথায় যেন আমরা সহসাচোখে নিজেদের ধ্যান ফিরে পেলাম। রঞ্জন জিজ্ঞেস করল- " আপনি কি এখানেই থাকেন?" কথায় উত্তর দেওয়ার আগে আবারও একগাল হাসি হেসে সে বলল- "মুই নিসঙ্গী, জঙ্গলপাশে কুসুম পাড়ায় থাকি"। ফেরার পথে নিসঙ্গীর সাথে জমল আমাদের সংক্ষিপ্ত আলাপ। দিন শেষের ওই সংক্ষিপ্ত আলাপখানি যেন ওই দিনের সবচাইতে বড় পাওনা -এক নতুন বন্ধু নিসঙ্গী।

পরদিন আবারও বেরিয়েছি জঙ্গলের উত্তরাঞ্চলে, পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কলসী নদী, কলসীর জল স্ফটিক, তবে তার গতি যেন স্থির হয়ে এসেছে। সন্ধের আবছা আলোয় প্রকান্ড মহুয়ার ছায়া গুলো যেনো কলসীর জলে জীবন্ত দানব হয়ে নড়াচড়া করছে। এমন সময় আবারও দেখা ওই নিসঙ্গীর সাথে। দেখা হতেই খিল খিল করে হেসে বলল -"বাবুরা এইখান যে! চায়ে দ্যাখেন - দখিন পাশে রক্ত পলাশের মেলা, আর উত্তরে জঙ্গলী হরিণের খেলা"। এইরকম আরো কতকিছু খোলা মনে বলতে বলতে খিল খিল করে হাসতে লাগলো। আমরা যে রীতিমত নিসঙ্গীর রূপ মাধুর্য্য ও প্রাণ খোলা স্বভাবের প্রেমে পড়ে গেছি, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এরপর থেকেই নিসঙ্গী আমাদের প্রতিদিনের জঙ্গলভ্রমণের নতুন সঙ্গী এবং সর্বোপরি আমাদের গাইড।

দেখতে দেখতে আমাদের শহরে ফেরার দিন চলে আসে। এইকথা শোনার পর নিসঙ্গী হঠাৎই চুপ হয়ে যায়। তার চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দানা বাঁধে। এই কয়েকদিনের পরিচয় যেনো অনেকখানি বেঁধে দিয়েছিল আমাদের সকলকে। সকলেই নিশ্চুপ। কিছুক্ষণ পর নিসঙ্গী বলে ওঠে "বাবুরা কয়্যাছিলেম শহুরে যাউয়ার আগেরদিন আপনারা মুই বাড়ি যাবেন। চলেন তালে"। এরপর আমরা রওনা হই নিসঙ্গীর বাড়ি কুসুম পাড়ার উদ্দেশ্যে। ইতি মধ্যেই সন্ধে নেমে আসে। জঙ্গলের চার মাথার মোড় হতে বাম দিকে কলসী নদীকে রেখে সোজা খানিকটা গিয়ে একটা মাঠ, দেখে বোঝা যায় কাছাকাছি কোনো লোকালয় নেই, মাইল তিন-চার দূরে একটা ছোট্ট গ্রাম বা বসতি

আছে বলে বোঝা যায়। আমরা যতই মাঠটার দিকে এগোতে থাকি, শীতের সন্ধ্যায় অন্ধকার যেন আরও গাঢ় রূপ নিতে থাকে। চারিদিক নিশ্চুপ, ঘুটঘুটে অন্ধকার, কানে আসছে কয়েকটা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। কিছুক্ষণ পড় চোখে পড়লো কিছু দূরে একটা লাল হলুদের আলো মিট-মিট করছে। ওই আলোক বস্তু কাছে আসতেই যা দেখলাম তা হতবাক করার মত। হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেছি একটা কবর স্থানের কাছে। রাশি রাশি জোনাকিরা একটা কবরস্তূপকে ঘিরে আলোকময় করে রেখেছে। যেনো জোনাকিরা জীবনভর এই কবরস্তূপকে ঘিরেই কাটাতে চায়। জোনাকির আবছা আলোয় কবরের গায়ে লেখা নাম চোখে পড়ে- "মায়াবতী"। হঠাৎ নিসঙ্গী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে, ভাঙা গলায় বলে "বাবুরা মুই সঙ্গী হবি?" তার একটা আঙুল কবরের স্তূপের দিকে করে বলে ওঠে- "এই মুই ঘর"। পরবর্তী মূহূর্তের জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। কথাটা শেষ করা মাত্র হঠাৎ করে নিসঙ্গী সম্পূর্ণ রূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। নিসঙ্গী যেন হারিয়ে যায় ওই গহীন অন্ধকারে।

আমরা ভয়ে স্তব্ধ হয়ে ছিলাম, বুকে চেপে তাকা একটা গুমোট কান্না যেনো উন্মাদ করে তুলল আমাদের, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এক দৌড়ে কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে যখন কটেজে ফিরি, তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারো।

সুনয়ন বাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সুচেতনের ডাকাডাকিতে উঠে এসে দরজাটা খুললেন। আমাদের চোখ-মুখের অবস্থা দেখে একটু স্তম্ভিত হলেও কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। সারারাত ভয়ে, বিস্ময়ে, এক অজানা বেদনায় আমাদের তিনজনের কারও চোখে আর ঘুম আসলো না। পরদিন সকালে সুনয়ন বাবু ডেকে পাঠালেন আমাদের বললেন "কাল রাত্রে কি হয়েছে খুলে বলুন"।

আমাদের মুখের বর্ণনা শুনে উনি বললেন, "ও মায়াবতী, নিজাম কন্যা, ওর রূপ মাধুর্যের কাছে যেন সারা মহুয়ার দেশও মাথা নত করত। জন্মকালে মাকে হারায়। নিজাম মুটের কাজ করত, দারিদ্রের সংসারে বাপ-মেয়ের জীবন বেশ হেসে খেলেই চলত। গত দশকের দুর্ভিক্ষে নিজামের কাজ চলে যায়। সংসারের অবস্থা যেন প্রদীপের শেষ সল্‌তে। বাড়ির ঘটি, বাটি বিক্রি করে কদিন কোনোপ্রকারে একবেলা চললেও, অবশেষে পেটের দায়ে বাধ্য হয়েই তার বাস্তু ভিটেটুকুও বন্ধক রাখতে হয় নায়েব উদয়রাম সর্দারের কাছে। কিন্তু পরে ঋণের বোঝা বইতে না পেরে তার শেষ সম্বলটুকুও হারায়। শেষে উদয়বাবু তার ক্ষমতার বলে নিজামকে গ্রাম থেকেও উচ্ছেদ করে। বাপ-মেয়ে মিলে কলসী নদীর পাড়ের ফাঁকা মাঠে একটা পর্ণকুঠীর বানায়। মায়াবতীর বয়স তখন ষোলো-সতেরো হবে, একদিন সে তার গ্রামের বন্ধুদের সাথে দেখা করতে গ্রামে আসলে নায়েব মশাইয়ের লোকেরা তাকে সবার সামনে অপমান করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। কয়েকবার মারও খেয়েছে নায়েব মশাইয়ের কাছে। দারিদ্রতা যেন তার জীবনভর সঙ্গী। কিছুদিন পর বুকের ব্যামোয় হঠাৎ প্রাণ যায় নিজামের। এরপর মায়াবতী চির একাকী। উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াত মহুয়ার জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। হঠাৎ একদিন জঙ্গলের উত্তরাঞ্চলে জঙ্গীপাড়ায় একদল চোরাশিকারির গুলিতে প্রাণ যায় মায়াবতীর"। সুনয়নবাবু শেষ করলেন।

আমরা সকলে নিশ্চুপ। একাকীত্ব যেন জন্মান্তরকেও হার মানায়। তাই বোধহয় মায়াবতী আজ নিসঙ্গী। নিসঙ্গীর ওই কথাটা আজও কানে বাজে "বাবুরা মুই সঙ্গী হবি?"

Days

Mariom Mamtaj
(1st year, 2021-2023)

There are days when you want to beat the world
And days when you just want to see it going round.
Days when you paint dreamscapes on the wall
And also days of struggling to get up when you fall.
There can be days when you think you can climb mountains
Followed by days you sit back on your couches.
Days of incessant rain and clear days of summer
Could not but give way to days you did not find yourself dumber.
Days your eyes shine brighter than the blazing sun
Are just like the days you brood over things undone.
The days you dare to work on your ruinous dreams
Are the ones that make you happy at the sight of splitting sunbeams.
Days of twisted knives and winless fights,
Faithless love and endless plights
Shall end round the corner of fearless flights.
Days are sometimes but a winter's tale;
Ships are safe at shore, yet set sail.
Days come and go like dandelions in the wind
Filling us with a universe of memories
That you want to recollect sipping tea in your balcony
Counting blessings and on your best found epiphany
That life is meant to live through
If only in the hope of the days that come and fill the voids in you.

Pic Courtesy: unsplash

মজার ছলে

শ্রেয়া দেবনাথ
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

দেখুন, অতি আশা বুকে নিয়ে এক ঝাঁক হতাশা পিঠে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার থেকে আসল সত্যিটা অকপটে আগেই স্বীকার করে নেই। তারপরও যদি আপনার মনে কৌতূহলের বিন্দুমাত্র কিছু অবশিষ্ট থাকে কিংবা রাতে নিদ্রাহীনতায় ভুগতে ইচ্ছুক হন, তাহলে নিঃসংকোচে লেখাটা পড়তে পারেন। আসলে এতো কষ্ট আমি দিতাম না কিন্তু আমার সহপাঠিনী আবার এই পত্রিকার এডিটর, সবাইকে বলে রেখেছেন আমি নাকি গল্প লিখবো, আমাকে রীতিমতো থ্রেট দিয়েছেন, না লিখলে নাকি ওনার মান সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে! ওকে বললাম আমার বাইশ বছরের জীবনে না আছে রোমাঞ্চ না আছে প্রেম, আমি আবার কী গল্প লিখবো! উনি ইমাজিনেশন থেকে লেখার উপদেশ দিলেন। তবে আমি আমার ইমাজিনেশন কে একদম ভরসা করি না। কেন! আরে পরীক্ষা দিয়ে কত পেতে পারি সেটাই ইমাজিন করতে পারি না! সে নাকি আবার আস্ত একটা গল্প ইমাজিন করে নামিয়ে দেবে! ঠিক এই মুহূর্তে মানুষের অলিখিত দুটি রেচন পদার্থ এক সাথে পায়, যথাক্রমে রাগ ও হাসি। তবে লিখতেই যখন বসেছি তখন একটু গল্প করে যাই বরং।

ছোটো থেকে স্কুলের সাথে আমার একটাই সম্পর্ক ছিল, সেটা হলো যাতায়াতের। বেশি ছোটোবেলার কথা মনে নেই বলে গল্পটা পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর গার্লস স্কুল দিয়ে শুরু করি। তো সেখানে শিক্ষিকাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো একপাক্ষিক, অর্থাৎ প্রতি শ্রেণীর কার্য্যসূচিতে দিদিমণিদের নাম লেখার জন্য তাদের নাম টা আমি জানলেও আমার নামটা তারা জানতেন না। কীকরেই বা জানবেন! ওনাদের প্রাপ্ত সূচিতেও তো কেবল ওনাদের নাম থাকত আর স্কুলে আমি এমন কিছু কেউকেটাও ছিলাম না। তো ওই দিদিমণিদের মধ্যে কেউ কেউ আমার নাম না জানলেও মুখ নিশ্চই চিনতেন, নাহলে কীকরে রোজ এসে পঞ্চাশটা মেয়ের মধ্যে খুঁজে নিয়ে আমাকেই বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেবেন বলুন! বড়ো ভালো ছিলো কিন্তু সেই দিনগুলো, জীবনে কোনো চাপ ছিলোনা বা কেউ আমার উপর নির্ভরশীল ছিল না! তবে বকা খাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ছিলাম। স্কুলের পড়া কোনো কালে করে নিয়ে যেতাম না, তাই সম্পর্কটা যাতায়াতে এসে ঠেকেছিল।

তখন গান শিখতাম কিন্তু সেকী আর আমি একা শিখতাম! পড়াশোনার থেকেও বেশী প্রতিযোগিতা সেখানে। তখন বাচ্চা মন, সবাই চাইছে মাইকে গান করবে। কিন্তু স্কুলে কড়া নির্দেশ সকল কে সুযোগ দেওয়া যাবে না, সময় পরিসীমিত। তাই আগে ভালো করে শেখো তারপর গান গাইবে। যাক সুযোগ পেলাম না ভালই হয়েছে।, এই হেঁড়ে গলায় চিৎকার কারোর না শোনাই ভালো ছিল বাবা! কী দরকার! পর্দা ফাঁটলে পুলিশ কেস হয়ে যেতো। কিন্তু বাচ্চা মন, সে মন তো মানতেই চায় না, তার তো মাইকে একবার গাইতেই হবে। পরে একবার শিক্ষক দিবসে গানের ম্যাডাম কে চেপে ধরলাম একটা গান করবো! করবই করবো! গম্ভীর ভাবে বললেন কী গাইবি? আমি অনেক কটা রবীন্দ্র সংগীত এর অপশন দিলাম কিন্তু সেগুলো এতই কমন যে উনি রাজী হতে চাইলেন না। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা, গান একটা গাইবোই। এতো চাইলে জয় তো অবসম্ভাবী। লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া গেয়ে বীর দর্পে স্টেজ থেকে নেমেছিলাম সেদিন।

তখন অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত, আসলে পাঠরত বলার থেকে পঠন-পাঠন থেকে ফাঁকিরত বলা বেশি ভালো। এই সপ্তম আর অষ্টম শ্রেণীতেই আমাদের ছাত্রজীবনে 'নর নরৌ নরা বেঞ্চির উপর দাঁড়া' যুগের সূচনা হতো। মানে এবারের কাহিনীটা সংস্কৃত কে আঁকড়ে ডাল পালা বিস্তার করবে। প্রথম প্রথম স্কুলের বাইরে একটিই দোকান ছিল যেখানে স্কুল ছুটির পর ছাত্রীরা মৌমাছির মতো ভিড় করতো, সেটি ছিলো পেয়ারা মাখার দোকান। কিন্তু আমি তো ওসব খেতাম না। অবশেষে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, ওখানে এসে গেলো আলুকাবলি কাকু। এবার আমায় কে সামলায়! স্কুলের ঘন্টা বাজলো কী বাজলো না, আমার হাতে রেডি থাকতো তিন টাকা। ব্যাস, 'কাকু আমাকে, কাকু আমাকে' বলে শুরু হতো বিপ্লব। সেই আলুকাবলি খেতে খেতে মহানন্দে বাড়ি ফিরতাম। কিন্তু, আমার সুখ ভগবানের বেশিদিন সহ্য হলো না, ঠিক সংস্কৃত ম্যাডামের চোখে পড়ে গেলাম। পরের দিন স্কুলে এমন কিছু ঘটতে চলেছিলো যা আমি কল্পনাও করিনি। যথারীতি ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকলেন, তারপর হঠাৎ-ই বলে উঠলেন 'যখন আলুকাবলি খাস তখন পৃথিবী ধ্বসে গেলেও তো খেয়াল করবি না!' আমি একটু এদিক ওদিক তাকাতে বললেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ তোকেই বলছি।' উঠে দাঁড়ালাম। কিছু বলতে পারলাম না। সত্যি বলছি, এতো লজ্জা লেগেছিল যে অতো লজ্জা পেতে অজয়ের বউ কাজলকেও কোনো সিনেমাতে দেখা যায় নি। সেদিনের পর থেকে কোনদিনও আলুকাবলি খাই নি ঐ কাকুর কাছ থেকে। আজও বসে ঐ কাকু ওখানেই, ওই রাস্তায় গেলে দেখতে পাই আর পুরোনো স্মৃতিগুলো এভাবেই বেঁচে ওঠে কিন্তু..... না থাক খাবো না।

বড়ো পানসে লাগছে নিশ্চই গল্প গুলো! আমি কিন্তু আগেই বলেছি আমার জীবনে রোমাঞ্চ আর প্রেম দুইয়েরই অভাব।

যেকোনো স্কুলে বিপদ কিংবা আপদ যেটাই বলুন না কেন সেটা হলো গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গার্জেন মন্ডলী। ওই মন্ডলীতে খোঁজ নিলে কোন ম্যাডামের বাড়িতে সকালে কী রান্না হয়েছে থেকে শুরু করে ব্ল্যাকে হাউসফুল সিনেমার টিকিটও পেয়ে যেতে পারেন। যাই হোক।

একবার স্কুলে ক্যাচ ক্যাচ খেলবো বলে একটা প্লাস্টিকের বল নিয়ে গেছিলাম। যাকেই খেলতে ডাকি তার মুখেই এক কথা 'পারিনা আর পারিনা'। আমি নিজেও কিন্তু ঝুলন গোস্বামী নই! অবশেষে দু তিনজনকে জোগাড় করলাম। যাতে একটু জায়গা হয়, তাই ম্যাডামের টেবিলটা একপাশে সরিয়ে দিয়েছিলাম। ব্যাস যুগান্তকারী ভুল। ক্লাসে ম্যাডাম চলে এলেন। সেই হাজার বছরের পুরনো ডায়লগ- 'এটা কে করেছে!' আমি থতমত খেয়ে এগিয়ে গেলাম। আর কিই বা করি! ঠিক কাঁটা ঘায়ে চিলি সস ঢেলে দিলো একটা মেয়ে। ওর মনে

আশঙ্কা জেগেছিল এই বল নিয়ে খেলার জন্য নাকি মাথা ফেটে যেতে পারতো যে কারোর! আরে বাবা ফাটেনি তো! এইসব বলার জন্য আমিও তো ওকে নিয়ে ক্যাচ ক্যাচ খেলতে পারতাম, খেলিনি তো! আমাকে বলতে পারতিস

পরে, ম্যাডামের সামনে বলার কী দরকার ছিলো! গার্লস স্কুলে সব দোষের একটাই প্রায়শ্চিত্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কোনো মডিফিকেশন নেই। কেন! একটা রড ধরে ঝুলিয়ে রাখতে পারতেন, তাহলে আমার হাইটটা পাঁচফুট থেকে বেড়ে অন্তত পাঁচফুট একও তো হতে পারতো!

বারো ক্লাসে আমাদের সম্মুখীন হতে হয় দি গ্রেট রাগী ম্যাডামের সাথে। আমাদের বায়োলজি ক্লাস নিতেন। আর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ওনার একটাই ডিমান্ড, পারফেকশন। ওনার মুখে প্রশংসা শোনা মানে আমাদের একরকমের ওয়ার্ল্ড কাপ জেতা। একটা শব্দমুখরিত ক্লাসরুমকে এক নিমেষে চার্চে কনভার্ট করে দিতেন। আর আমাদের হৃদয়ের হৃদপিন্ডে চার্চের বেল বাজত - ঢং...ঢং...ঢং...। মাইক্রোস্কোপের তলায় আমরা যাই রাখি তাতেই উনি বড় বড় কালো কালো বাাাা..বল খুঁজে পেতেন, পাতি বাংলাভাষায় কালো কালো দাগ আর কি! আমি তো ছোলার মূলের এমন প্রস্থচ্ছেদ্ করতাম যে কোষ গুলোর অংশচ্ছেদ্ ঘটে যেত। সেই সময়ে মাঠে গিয়ে গাছ গোনা টাইপের একটা প্র্যাকটিক্যাল ছিলো। সেদিনটা আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম আর মাঠে গিয়ে লটারি করতাম কোন গাছ কটা থাকবে। পুরো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস মাঠে ঘুরে বেড়াতাম। একদম লাইসেন্স নিয়ে ঘোরা যাকে বলে! তবে আশ্চর্য্যের বিষয় হলো কোনদিন ধরা পড়িনি! তখন সাময়িক ভাবে নিজেরা ক্রেডিট নিলেও আজ বুঝতে অসুবিধা হয় না রাগী মানুষেরও মন থাকে, উনি সবটা বুঝেও উপক্ষো করে যেতেন।

সেবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার দুমাস পরে জয়েন্ট এন্ট্রাস এক্সাম হয়েছিল। চারিদিকে যুদ্ধের আয়োজন, সবাই নোকিয়ার ডাব্বা ফোনের মতো ভাইব্রেট করে দুলে দুলে পড়ছে। সে যেনো এক অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি! জয়েন্ট সম্মন্ধে সম্যক ধারণা আমার তখন ছিল না। শুধু জানতাম এ বড়ো কঠিন পরীক্ষা, পড়াশুনার জগতের উচ্চপদস্থ ছাত্র-ছাত্রীরা কঠিন তপস্যার মাধ্যমে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লাভ করে থাকে। কিন্তু স্রোতে ভেসে পাবলিক ডিমান্ডে ওয়েস্টবেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফর্ম ফিল-আপ করেছিলাম। যথারীতি যজ্ঞের দিন উপস্থিত। আমি বিনা প্রস্তুতিতে ঈশ্বরের প্রতি অগাধ ভরসা নিয়ে হলে ঢুকলাম। নাহ্, র‍্যাঙ্ক করার প্রত্যাশা ছিলো না, মান সম্মানের ভয়টাই খানিক ছিলো। ওটা হাতে নিয়ে ফিরতে পারলেই যথেষ্ট। পরীক্ষা শুরু হলো। যেগুলো না পারলেই নয় করলাম, করে বসে আছি। ভাবলাম ঈশ্বরের সহায় নেই। ভগবানের নাম নিয়ে টিক দেওয়া শুরু করলাম। ঠিক যেমন স্টুডেন্ট অফ দা ইয়ার সিনেমাতে দেখিয়েছিল তুক্কা মেরে প্রথম। ব্যাস আর কী চাই! কিন্তু আমারটা তো আর করণ জোহার পরিচালিত তুক্কা ছিলো না, তাই ফ্লপ করেছিলো।

তারপর তো কলেজ জীবন, কলকাতা, নতুন নতুন বন্ধু, হোস্টেল, একরাশ স্বাধীনতা - মফস্বলের মেয়েটার জীবনে একেবারে রেনেসাঁ ঘটে গেলো। এভাবেই ছোটো থেকে ফাঁকি মারতে মারতে জীবনে চলার পথে ছোটো খাটো ফাঁক না, অনেক খাল, বিল, পুকুর বানিয়ে ফেলেছি ঠিকই কিন্তু স্কুল জীবনের ওই ছোটো ছোটো গল্পগুলো ঘিরেই আমি আর আমার জন্য এই গল্প গুলো।

খুকুর দুপুর

শালিনী মাজি
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

নিঃঝুম দুপুর বেলায়,
যেই সব ঘুমিয়ে পরে,
খুকু একছুট লাগিয়ে,
চলে আসে বিছানা ছেড়ে।

মা ঘুমোয় নিজের মতন,
সোনামাও পাশের ঘরে
বোনটাও বালিশ মাথায়,
ঘুমিয়েছে অকাতরে।

খুকু গালে দুহাত দিয়ে,
ভাবে বসে বারান্দাতে,
লুকাবে কোথায় এখন,
মা খুঁজে পায়না যাতে।

চট করে বুদ্ধি খেলে,
টিপে টিপে পা দুখানি,
সিঁড়ি বেয়ে, রেলিং ধরে,
ছাতে আসে খুকুমণি।

ব্যাস আর পায় কে তাকে,
ছাতে এল বড়ই মজা,
কত পাখি, পোকা মাকড়,
গাছপালা তাজা তাজা।

খুকু সারা দুপুর ধরে,
ছাত পরে নেচে বেড়ায়,
কখনো বা মুঠো ভরে,
ঝরে পরা পাতা ওড়ায়।

এইফাঁকে বিকেল নামে,
বালতিতে জল ভরে নেয়,
শুকনো টবের গাছে,
মগ দিয়ে জল ঢেলে দেয়।

সুয্যি ডুবলে পরে,
খুকু দেখে মুগ্ধ হয়ে,
কে যেন আকাশ জুড়ে,
দেয় কত রঙ ছড়িয়ে।

ঝুপ করে সন্ধ্যে নামে,
ওমনি সে খেয়াল করে,
"ওই খুকু দুধ খাবি আয়ে"
মা ডাকে এইসা জোরে।

দুপুরে না ঘুমালেও,
মা তাকে ভালোইবাসে,
সে যে রোজ সন্ধ্যেবেলা,
বই নিয়ে পড়তে বসে।

Before Sunrise-A lover's dream

(Film review)

Subhajit Kala
(2nd year, 2020-2022)

Jump ahead ten, 20 years. And you are married. Only your marriage doesn't have that same energy that it used to have. You start to blame your spouse.
You start to think about all those people you've met in your life and what might have happened if you picked up with one of them?
A German couple is arguing violently on a train. A girl, disturbed, changes her seat and sits right across a boy. They caught glimpses of each other and they start talking. And eventually, the boy pursues the girl to get off the train and hang around Vienna with him. Jesse and Céline start to know each other.

"We got a Sunset here, we got a ferries wheel....." and they Kiss each other.

Then, the day comes to an end and the night emerges. And the magic of Cinema starts. It feels we are in a dream. A dream of a lover. The reality is nowhere as beautiful as a dream. Maybe because we are ignorant, selfish. We don't want to be with Someone else, we want to be with Ourselves.

There is a beautiful sequence in a listening booth.

"No, I'm not impossible to touch.
I've never wanted you so much."

Céline is staring at Jesse with her beautiful gaze, and whenever Jesse is staring at her, She looks away.
I can't describe this beautiful scene.
This scene is pure affection, full of Love. It melts my heart. It is possibly one of the most romantic scenes ever created onscreen.

The director, Richard Linklater, spent nine months on casting. Ethan Hawke (Jesse) and Julie Delpy (Céline) are so perfect that it seems that the characters were written around them.

Jesse and Céline experience the night rapturously. They dance, they hug and they kiss each other. They share their thoughts. To be honest there is a lot of talking in this. They talk about incessant battles of our lives, both inner and Outer. They talk about man-woman dynamics, feminism, conflicting happy relationship....
much more. All this talking could have been boring in other circumstances. But not here. Delpy and Hawke

rewrote the dialogues to make them playful and romantic. They filled the screen with their mannerisms, with their personal touches, beautiful little things like Celine's making of faces. It's like all the serious conversations are wrapped with non-serious chocolates.

"You have no idea where I came from,
We have no idea where we are going,
Lodged in lifelike branches in the river
Flowing downstream, caught in the current
I'll carry you, You'll carry me"

In our relationship, we have to support each other. If the balance breaks, it'll become a burden.
Jesse and Céline knew the intensity of love fades out, promise losses its meaning. And we become alone in a relationship. We become alone in our lover's arms.
So they decide that it's their last night.

This Cinema looks more like dream than real-time. All the night scenes bear the evidence.

When another train was passing, there was a soft red glow on Celine's face. She looked like Botticelli angel.
Here beside the magnificent faces of the actors, the city and its places bear a lot to make that dream. Lee Daniel's camera worked here like a magic potion. Whatever it touched, became dreamy.

"I believe if there is any kind of God, it would not be in any of us, not you or me. But just this little space in between. If there's any kind of magic in this world, it must be an attempt of understanding someone, sharing something. I know it's almost impossible but who Cares? The answer must be in the attempt."

Before leaving they make a promise to come back hereafter
But will they?
Maybe we are unable to Love, maybe we can not touch someone within. But we try. Ingmar Bergman's trilogy is the cruel truth about human relationships and Linklater's Before trilogy is a dream, A Lover's dream. Maybe the horses turn into mice, maybe the chariotv turns into Pumpkin at dawn, But Still, We Love…. We Dream. Because it's the night that matters.

Physics

সোনাক্ষী সাহা
(প্রথম বর্ষ, ২০২১-২৩)

Physics মানে thinking আর নতুন রকম সৃষ্টি
এসব জিনিস গড়ে তোলা তো মানবজাতির কীর্তি।

Physics বলতেই মাথায় আসে নিউটনের সেই সূত্র
গাছের তলায় বসেই সে আবিষ্কার করে মহাকর্ষ।

'আকাশ ভরা সূর্য তারা'
কাছ থেকে কে দেখতে না চায়
গ্যালিলিওর সেই দূরবিন ছাড়া আছে কী আর উপায়?

অ্যাস্পিয়ার যে সাঁতার কাটে তারের উপর দিয়ে
ফ্লেমিং আবার আঙুল তিনটি রাখে 90° angle-এ।

Fan ঘোরে, গাড়ি চলে – এতেও আছে Physics
একে ছাড়া দিন কাটানো সত্যিই বড় risk.

আইনস্টাইন, ম্যাক্সওয়েল আর লেঞ্জের সব সূত্র
Physics হল তাদের হাতেই গড়ে ওঠা মৃৎপাত্র।

রকেট চেপে যাচ্ছে মানুষ মহাকাশের পানে
Physics ছাড়া এই ঘটনা ঘটত কী না কেই বা সেটা জানে?

আলো, শব্দ, বেগ, ত্বরণ - সব ব্যখ্যাই Physics-এর দান
তাই তো মানবজাতির কাছে এর এক নম্বরে স্থান।

ভাইরাস!! যার কোনো ভ্যাকসিন নেই

সৌম্যজিৎ বোস
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

আপনি এখন আমার এই লেখাটা পড়ছেন মানে আপনি সুস্থ আছেন শারীরিক ও মানসিক ভাবে; সুস্থ যদি বা নাই ধরি অন্তত বেঁচে আছেন। আসলে বিগত দেড় বছর ধরে চলা পরিস্থিতি মোটেই সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার মতো ছিল না তা বলাই বাহুল্য। একটা না দেখতে পাওয়া জিনিসই চোখের সামনে থাকা অনেক কিছুকেই পাল্টে দিয়েছে। কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ছোট্ট ভাইরাস টা, WHO যার বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন কোভিড -19।

সময়টা কুড়ি সালের মার্চ; ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী 'জনতা কারফিউ' ঘোষণা করেছেন। শব্দটার সাথে পরিচিত ছিল না রবি, রোজকার কাজে তেমন লাগেওনি তাই শোনার প্রশ্ন ওঠে না। সেদিন হোটেল-এ টিভি টা চালানো ছিল, কাজ করতে করতেই দেখেছিল করোনার জন্যে প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বেশ কিছু ঘোষণা করছেন। ও হ্যাঁ, এপ্রসঙ্গে বলি রবি মানে রবি দাস, অনন্তনগর বাস স্ট্যান্ডের পাশে যে 'আনন্দ হোটেল' আছে সেখানে খাবার দেওয়া, টেবিল পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ করে সে; রোজকার কাজের ভিত্তিতে মাইনে পায়। বাবা ছোট বেলাতেই মারা যায়, মা পরিচারিকার কাজ করে, এক ভাই মুম্বাই-এ থাকে; রাজমিস্ত্রির সহযোগীর কাজ করে সে। এইট এর পর পড়াশোনার সুযোগ হয়নি তাদের কারোর। তো যাই হোক গল্পে ফেরা যাক; এমত অবস্থায় মালিক এস বললো, "রবি, কাল কাজে আসিস না বুঝলি, জনতা কারফিউ আছে, আর বোধহয় বেশ কয়েকদিন এরপর হোটেল বন্ধ রাখতে হতে পারে। যে হারে রোগটা ছড়াচ্ছে লকডাউনই করবে মনে হচ্ছে সরকার।" রবি সেদিন বাড়ি ফিরলো, মাকে এসে কিছু খেতে দিতে বলে হাত মুখ ধুতে গেলো। খেতে খেতে মায়ের কাছে শুনল তার মা যে বাড়িতে কাজ করে তারাও কাল আসতে বারণ করেছে।

যাইহোক পরেরদিন রাস্তাঘাট চারিদিকে শুনশান; যেন সত্যি সত্যি কারফিউ লেগে গেছে। বিকেলবেলা রবি একটু বাড়ির উঠোনে বেরিয়েছে; পাশের তারক বাবুর বাড়ির টিভিটা একটু জোরেই চলছিল। সেখান থেকে ভেসে আসা আওয়াজে রবি বুঝলো আগামীকাল থেকে লকডাউন ডেকেছে সরকার, যার কথা মালিক বলেছিল কালকে তাকে। কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেলো সে। পরদিন সকালে হোটেলে গেল রবি, মালিক তাকে আর বাকি কর্মচারীকে ডেকে বললো "সবই তো শুনেছিস নিশ্চয়, আজ বিকেল থেকে লকডাউন, হোটেল তো বন্ধ রাখতে হবে, কাল থেকে আর আসতে হবে না তোদের, ফোনে যদি কোনো ডেলিভারি আসে আশেপাশের তো আমিই গিয়ে দিয়ে আসবো।" কবে আবার হোটেল খুলবে, মাইনে পাবে কিনা এরকম অনেক প্রশ্ন রবির মাথাকে ঘুরলেও মুখে কিছু বলতে পারলো না সে; কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেদিনের মজুরি নিয়ে ঘরে ফিরল সে। বাড়ি ফিরে মাকে সব বললো, মা বললে "আমার মালকিন বলেছে কাজে আসতে; ও বাড়ির তো অনেক কাজ আর মালকিন কাপড় ধোয়া, ঘর পরিষ্কার এসব কাজে ততটা অভ্যস্ত নয়। তবে মাস্ক কিনে পড়ে যেতে বলেছে আর হাত ধোয়ার জলের শিশি সাথে নিয়ে যেতে। কাল তেকে নাকি রাস্তায় পুলিশ থাকবে। এসব ছাড়া রাস্তায় দেখলে পিটালে ওরা দায়িত্ব নেবে না।" "যাক তাও তোমার কাজটা থাকলো, একদিকে নিশ্চিন্ত, আমার হোটেল তো কবে খুলবে মালিকও জানে না" বলে কি যেন ভাবতে লাগলো রবি।

দিন সাতেক গেলো; একদিন রবির ফোন টা বেজে উঠলো। ফোনের ওপার থেকে তার দাদা জানালো তার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, ওখানকার সব বাঙালিরা ফিরে আসছে নিজের দেশে। এতো বাজে সবকিছুর মধ্যেও দাদা অনেকদিন পর আসার খবরে রবি বেশ খুশি হলো। মাকে জানালো পরশু দাদা আসবে বাড়িতে। মা তো খুশিতে আত্মহারা হয়ে পরশু কি কি রান্না করবে সেই নিয়েই বলে গেলো। পরশুদিন হলো, দাদার তো দুপুরের মধ্যে চলে আসার কথা, এখন তো বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলো প্রায়; এদিকে ফোরেও পাওয়া যাচ্ছেনা। এমত অবস্থায় একটা পুলিশ ভ্যান তার বাড়ির দিকে আসতে দেখলো সে। সে তো খবরে দেখানো সব নিয়ম মেনে চলেছে, তবুও কেন পুলিশ আসছে এই ভেবে কিছুটা ভয় পেয়ে গেলো রবি। পুলিশ ভ্যান থেকে দুজন পুলিশ বাইরে বেরিয়ে রবিকে জিজ্ঞেস করলো " এটা কি সুশান্ত দাসের বাড়ি? মাঠ পাড়া, অনন্তপুর।" রবি জানালো এটাই তার দাদা সুশান্ত দাসের বাড়ি। একজন পুলিশকর্মী রবির কিছুটা কাছে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে "আজ সকালে ঔরঙ্গাবাদের কাছে ট্রাকে করে কিছু শ্রমিক ফিরছিল কলকাতার উদ্দেশ্যে, সেখানে ট্রাক উল্টে প্রত্যেকেই মারা যায়। তার মধ্যে তোমার দাদা সুশান্ত দাসও ছিল; ওনার আধার কার্ড থেকে ওখানকার প্রশাসন আমাদের থানার সাথে যোগাযোগ করে।" কথা শেষ হতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে রবির; এমনটা তো হওয়ার কথা ছিলনা, আজ তো তার দাদার এখানে আসার কথা ছিল, তবে কেন এমন হলো! এই সব কথা তার মা-ও শুনছিলেন দরজা থেকে, নিমেষেই জ্ঞান হারালেন তিনি। দুজন পুলিশকর্মী সাথে থাকায় তাদের তৎপরতাতেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো; জ্ঞান ফিরতে মাকে বাড়িতে নিয়ে এলো রবি। সেইদিন রাত্রে বিন্দুমাত্র জল স্পর্শ করলো না তারা; রান্নাঘরে রাখা তার দাদার প্রিয় পোনা মাছের ঝোল আর আলু পোস্তর দিকে সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো তার মা।

আগামী বেশ কয়েকদিন অদ্ভূত মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় তার মা, কাজে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়। এমনই একদিন মালকিনের বাড়ি থেকে লোক এসে শাসিয়ে গেলো যে পাঁচদিন হলো সে কাজে যায়নি আর এতে মালকিনের বেজায় সমস্যা হচ্ছে; কাজ না করে ছেলের শোকে বসে থাকলে তার সংসার চলবে না, এরপর যদি কাজে না আসে তো তার মাইনে বন্ধ। পরদিন থেকেই আবার কাজে যেতে লাগলো সে। মুখ থেকে সামান্য মাস্ক খুললে বা হাত মুখ ঠিকভাবে ধুয়ে না করে ঢুকলেই এখন জোটে মালকিনের বকুনি। একদিন কাজে গিয়ে সে জানতে পারলো তাদের বাড়ির ছেলে বিদেশ থেকে ফিরেছে। সে ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করত। ইংল্যান্ড কোথায় তা সে জানতো না, কিন্তু সেটা জানতো অনেক দূরের কোনো একটা মস্ত শহর যেখানে সাহেবরা থাকে। তো যাইহোক একদিন কাজ করতে করতে বেশ কিছুবার কাশি হচ্ছিল তার; এই জন্য বার কয়েক বকুনিও খেতে হয়েছে তাকে; "তোকে যে বারবার বলি সারাক্ষণ মাস্ক পড়ে থাকবি, বারবার সানিটাইজ করবি, আর বাবুর থেকে সবসময় দূরে দূরে থাকবি, দেখ বাবা করোনা বাঁধিয়ে বসিস না কিন্তু; তোদের মতো লোকেদের থেকেই ভয়, একটুও হাইজিন মেইনটেইন করবি না, তোদের হলে তোরা তো মরবিই আমাদেরও মারবি। ছেলেটা বাড়ি এলো এতদিন পর আর এখনই কাশি বাঁধালি তুই।"

দিন তিনেক পর কাজে গেলে তার কাশি, সর্দি আগের চেয়ে বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। কিন্তু ওইদিন গিয়েই সে জানতে পারে মালকিনের ছেলের করোনা টেস্ট হয়েছে আর রিপোর্ট পজিটিভ হয়েছে। এবারে রাগে অগ্নিশর্মা মালকিন বললে- "আমার ছেলে কে প্রাণে মারার প্ল্যান করেছিস তুই, নিজের ছেলেকে হারিয়েছিস বলে এত রাগ! আমাদের করোনা করবি তুই! তোদের তো শরীরে কিছুই হবেনা অসুবিধে নেই; আমাদের কি যে হবে, হায় ভগবান। শেষমেষ কাজের লোক করোনা নিয়ে এলো গো! বাবুর এবার কী হবে। দূর হ আমার বাড়ি থেকে। তোদের মতো লোকেদের মরণ হয়না কেনো!" এসব কিছুর মাঝে বাড়ির কর্তা এসে স্ত্রীকে বলে "আরে এভাবে বলছ কেনো, ঠিক আছে বাবুর করোনা হয়েছে আমরা ডাক্তারের সাথে কথা বলবো। ওকে কাজ থেকে ছাড়িও না; বাড়িতে একজনের করোনা, তুমি বরং কিছুদিন ছুটি নাও, পরেরবার করোনা টেস্ট করে এসো।" অপমান আর দুঃখ সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলো সে ; ফিরে সব কথা রবিকে জানিয়ে বললো "যে বাড়িতে এত বছর কাজ করছি তারা বলল আমি নাকি ওদের মারতে চাইছি! শোন তুই আমার ঐ করোনা টেস্ট না কি বলে ওটা করবি?" রবি পরদিনই করোনা টেস্ট-এর জন্যে মা কে নিয়ে যায় হাসপাতালে, জানতে পারে তিনদিন পর রিপোর্ট পাবে।

তিনদিন পর হাসপাতালে রিপোর্ট আনতে গিয়ে জানতে পারে তার মায়ের রিপোর্ট নেগেটিভ। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে মাকে ডেকে বলতে থাকে- "মা এই দেখো, রিপোর্ট এসেছে, তোমার রিপোর্ট নেগেটিভ, মানে করোনা নেই তোমার শরীরে। আর তোমার সবজান্তা মালকিন বেকার তোমাকে দোষ দিচ্ছিল।" কিন্তু একি! কোনো সাড়া পেলনা রবি। এবার ঘরে ঢুকে রবি যা দেখে তাতে তার সারা শরীর পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে যায়। মেঝের ওপর বিষ খেয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে তার মার নিথর দেহ। পাশের বাড়ির তারক বাবুর রবির উদ্দেশ্যে জোরে গলায় করা কথা কানে এলো রবির "রবি, তোর মা ওই মিত্তির দের বাড়ি কাজ করে না? ওর ছেলে তো করোনা বাঁধিয়ে এসেছে বিলেত থেকে; শুনলাম এয়ারপোর্ট-এ নাকি ফাঁকি দিয়ে করোনা টেস্ট না করেই চলে এসেছে, আসার সময় থেকেই সিমটমস্ ছিল ভালোমতই; শুধু শুধু তোর মাকে দোষ দিল; নিজের ছেলের বয়ে নিয়ে আসা রোগের জন্যে অন্যকে দোষ! বড়লোকিয়ানা যতসব।" কথাগুলো শুনতে শুনতেই নেগেটিভ রিপোর্টটার দিকে তাকালো রবি, আর ভাবলো আসল প্রাণঘাতী ভাইরাস কি সত্যি করোনা নাকি গরীবের জন্যে করোনার চেয়েও প্রাণঘাতী ভাইরাস রয়েছে এই পৃথিবীতে!!

২০-২১ এর ক্লাসঘর

মৌলি সাহা
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

অনলাইন ক্লাসের প্রথম দিন,
দারুণ উদ্দীপনা;
ইউনিভার্সিটির ক্লাসরুম হল,
আমার ঘরখানা।

চলছিল ক্লাস গুগল-মিট -এ
কিংবা জুম্-কল-এ,
মনটা যেন উড়তে লাগল
আধ ঘন্টা হ'লে।

মা-বাবা সেই দেখছে খবর
বাড়ছে করোনা ভয়,
স্যানিটাইজার লাগবে আরো
এটুকুতে কি হয়!

ছোট্ট আমার বোনটি এসে,
করছে উঁকি-ঝুঁকি;
রাখছে খেয়াল, করছিটা কি ...
দিচ্ছি নাকি ফাঁকি!

সামনে আমার জানলা খোলা,
পরিচিত সেই রাস্তা-খানা,
মাস্ক পরে ঘুরছে সবাই!
কাউকেই যে যায় না চেনা!

পাশের বাড়ির বোন দুটি, ঠিক
আমার মতোই শান্ত;
মায়ের ফোনটা কার দরকার
সেই বচসায় ক্লান্ত।

এইভাবে মন আলে-ডালে,
ঘুরছে যখন নিজের মত,
ক্লাস চলছে ছোট্ট স্ক্রীনে,
নিয়ে ফিজিক্স-এর তত্ত্ব শত।

ভাবছি মাঝে, এখন যদি
ইউনিভার্সিটি খুলত;
সবার সাথে একঘরে বসে,
এই ক্লাসটাই চলত।

ক্লাসের পরে টিফিন খাওয়া,
ক্যান্সাসেতে হারিয়ে যাওয়া,
লাইব্রেরি তে বই না পাওয়া,
হয়তো এসব হতো।

স্যার মনে হয়, ধরতে পারেন!
নিঃস্তব্ধতা দেখে।
ঘুরছে যে মন এদিক ওদিক,
স্ক্রীনের ওপার থেকে।

আবার বোঝার চেষ্টা শুরু,
অলীক স্বপ্ন বুনে,
মনটা আবার স্ক্রীনে ফেরে,
"বুঝেছ?" প্রশ্ন শুনে।

কোচবিহারের রাসমেলা

শ্রেয়সী পাল
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

কথায় আছে, বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর এই তেরো পার্বণকে কেন্দ্র করেই প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি মেলার নিজ নিজ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য স্বমহিমায় বিরাজমান। এদের মধ্যে কোচবিহারের রাসমেলা অন্যতম। মদনমোহন ঠাকুরের রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এই রাসমেলা উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহত্তম মেলা রূপে সুনাম অর্জন করে আসছে। জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্র অবস্থিত প্রাচীন মদনমোহন মন্দিরের রাধাবিহীন গোপীবল্লভকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর কার্তিক পূর্ণিমার রাসযাত্রা তিথিতে রাসমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মদনমোহন বাড়ির সম্মুখস্থ বৈরাগী দিঘি

লেখক জয়নাথ মুন্সীর লেখা কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস "রাজোপাখ্যান" থেকে জানা যায়, কোচবিহারের ১৭তম মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ১৮১২ খ্রিঃ কার্তিক পূর্ণিমায় রাস তিথির পূণ্যলগ্নে বর্তমান কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ১৪ কিমি দূরে অবস্থিত ভেটাগুড়িতে নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং সেখানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজপ্রাসাদে প্রবেশের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি এই রাসপূর্ণিমা তিথিতে রাজবাড়ির দেবমন্দিরে নানাপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আলোকসজ্জা এবং মেলার আয়োজন করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৮৯০ খ্রিঃ মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ বর্তমান মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির পত্তন করলে সেই সময় থেকে এই মন্দিরের সামনে বৈরাগীদিঘির চারদিকে পূর্বের আয়োজিত মেলা স্থানান্তরিত হয়। কালক্রমে সেই মেলার কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানের রাসমেলা রূপে পরিচিত ও পালিত হয়ে আসছে। জনবৈচিত্র্যের আধিক্য, স্থানীয় প্রয়োজন, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তৎকালীন প্যারেড গ্রাউন্ডে (বর্তমানে রাসমেলার ময়দান নামে পরিচিত) এই মেলার পরিধি বর্ধিত করা হয়।

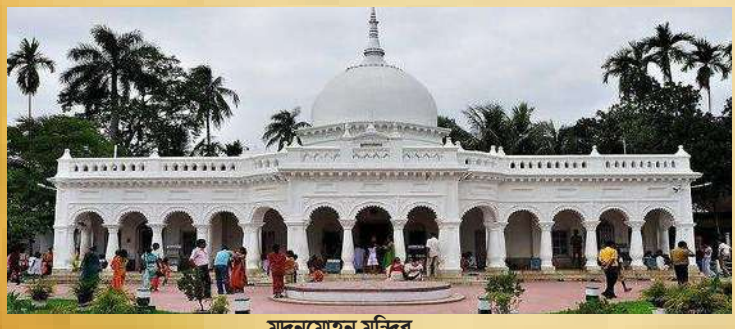

মদনমোহন মন্দির

কোচবিহারের রাস উৎসবের প্রধান আরাধ্য দেবতা হলেন রাজবংশের আদি দেবতা মদনমোহন জিউ। কথিত আছে, কোচ্ রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে বৈষ্ণব গুরু শঙ্করদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্বৈত

রুপোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মন্দিরের প্রধান আরাধ্য দেবতা মদনমোহন জিউ-এর বিগ্রহ

রূপ (একই অঙ্গে রাধাকৃষ্ণের দুই রূপ) প্রচারের জন্য নিজ জন্মভূমি অসম থেকে বিতাড়িত হয়ে কোচ্ রাজাদের শরণাপন্ন হন। কোচ্ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর ধর্মীয় প্রচার শুরু করেন। তাঁর এই ভাবাদর্শ থেকেই মদনমোহন জিউ-এর মূল বিগ্রহের ভাবনা এসেছে। ২০০ বছরের অধিক প্রাচীন এই মেলা মদনমোহন জিউ-এর পুজো ও যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই শুরু হয়ে থাকে। মদনমোহন দেবতার কক্ষ ছাড়াও মন্দিরের অন্যান্য কক্ষে অন্য দেবদেবীদের বিগ্রহও অধিষ্ঠিত। এছাড়া, মূল মন্দিরের থেকে খানিকটা তফাতে অবস্থিত ছোট মদনমোহন বাড়িতেও সাড়ম্বরে রাসযাত্রা পালিত হয়। ছোট মদনমোহন সারাবছর অন্তরালে থাকলেও এই রাস উৎসবের সময় তাঁর মন্দিরের দরজা সকলের জন্য উন্মোচিত হয়।

কোচবিহারের রাসমেলার অন্যতম আকর্ষণ রাসচক্র, যা হিন্দু ধর্মীয় আচারে এক বিরল অন্তর্ভুক্তি। মদনমোহন মন্দিরের পূর্বদিকে অধিষ্ঠিত দেবী ভবানী মন্দিরের সম্মুখ প্রাঙ্গণে বৌদ্ধ ধর্মচক্রের আদলে বাঁশের তৈরি প্রায় ৩০-৪০ ফুট উঁচু এবং ৮-১০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট চোঙাকৃতি কাঠামোর ওপর দেবদেবীর ছবি সমন্বিত অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য করা কাগজ-কাটা নকশায় তৈরি রাসচক্রটি সত্যিই মনোমুগ্ধকর। কোচবিহার জেলার ধলুয়াবাড়ি গ্রামের

রাসচক্র

এক মুসলমান পরিবার বংশ পরম্পরায় এই রাসচক্রটি তৈরি করেন। এই রাসচক্রের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা না গেলেও হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলিম ধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবেই এর প্রকাশ। পূর্বে রাজারা তাঁদের প্রজাদের মঙ্গলকামনায় এবং তাঁদের রাজ্যের উন্নতিসাধনের প্রার্থনায় এই রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের সূচনা করতেন। এই প্রথা অবলম্বন করেই বর্তমানে প্রতিবছর জেলাশাসক জেলার সার্বিক উন্নয়ন সাধনায় রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসব এবং রাসমেলার উদ্বোধন করেন। এছাড়া, মন্দিরের সামনের দিকে রাসমঞ্চের পাশে মাটির তৈরী বিশালাকার পুতুনা রাক্ষসীর অবয়ব

বিশালাকার পুতনা রাক্ষসীর মূর্তি

রাস উৎসবে আগত খুঁদে পুণ্যার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। মদনমোহন বাড়ির প্রাঙ্গনের চারিদিকে মহাভারত, রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন পুতুল সাজিয়ে পৌরাণিক ঘটনাগুলোকে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করা হয়, যা একটি লোকায়ত শিক্ষার বিষয়ও।

তৎকালীন কোচবিহারের ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং লোকায়ত বিশ্বাসের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ছিল রাসমেলার সর্ণা প্রথা। এই প্রথা অনুযায়ী রাস উৎসবের তৃতীয় দিনে কয়েক ঘন্টার জন্য মদনমোহন মন্দিরে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। শুধুমাত্র মহিলা ভক্তবৃন্দের জন্য মন্দিরের ভেতরে পৃথকভাবে ভাগ্‌বত পাঠ এবং যাত্রাগানের আয়োজন করা হতো। বর্তমানে এই সর্ণা প্রথার বিলুপ্তি ঘটলেও মদনমোহন বাড়ির মূল প্রাঙ্গনে এখনও রাস উৎসব উপলক্ষ্যে ভাগ্‌বত পাঠ, কীর্তন, বাউল, নামগান, যাত্রাপালা ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান ছাড়াও রাসমেলার মাঠে পুরসভা পরিচালিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি আধুনিক নাটক, নাচ, গান এবং উত্তরবঙ্গ খ্যাত ভাওয়াইয়া গানের আয়োজন করা হয়।

রাজ আমলের রাসমেলা

দেবত্র ট্রাস্টের অধীনে ও পর্যবেক্ষণে মদনমোহন বাড়ির রাস উৎসব এবং কোচবিহার পুরসভার পরিচালনায় এই রাসমেলা প্রায় ১৫ থেকে ১৭ দিন ধরে এক বিরাট এলাকা জুড়ে হয়ে থাকে। এরপর আরও প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলে ভাঙ্গা মেলা। উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়িক আঙ্গিকে রাসমেলার বাণিজ্যিক গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানীয় ব্যবসায়ী ছাড়াও অন্যান্য জেলার এমনকি ভিন্‌রাজ্য এবং ভিনদেশ থেকেও ব্যবসায়ীরা মেলায় আসেন তাদের পণ্যসম্ভার সাজিয়ে। মাটির পুতুল, শাল্, গরম কাপড়, কাঠের আসবাবপত্র, কাঁসা-পিতলের বাসন, পাথরের তৈজস, বাংলাদেশের ঢাকাই জামদানি, নলেন গুড় ও পদ্মার নোনা ইলিশ প্রভৃতি জিনিসের সম্ভার থাকে মেলায়। পূর্বে এই মেলার অপেক্ষায় সারাবছর কোচবিহার এবং তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষেরা মুখিয়ে থাকতো তাদের ঘর গৃহস্থালীর পণ্য সংগ্রহের জন্য। শত শত ভক্তিপ্রাণ নরনারী অবিভক্ত বাংলার রংপুর, পাশ্ববর্তী রাজ্য ভূটান, নেপাল, আসাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে গোরুর গাড়ি বা রথে চড়ে রাস উৎসবে সামিল হতে আসত। তৎকালীন প্রজাবৎসল কোচ্ রাজারা দূর-দূরান্ত থেকে আগত পূর্ণ্যার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধর্মশালার আয়োজন করতেন, যার মধ্যে মদনমোহন বাড়ির পাশের আনন্দময়ী ধর্মশালায় রাসমেলার সময় আজও পুর্ণ্যার্থীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে যানবাহনের পরিবর্তন ঘটলেও আজও সূদূর কলকাতা, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষের সমাগম ঘটে এই মেলায়। আগে মেলায় আগমনকারী মানুষদের খাদ্যতালিকায় প্রধান পছন্দের ছিল দই-চিড়া, বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি, কদ্‌মা, বাতাসা, জিলিপি, নানারকমের ছানার সামগ্রী, বিভিন্ন পশু-পাখির আকৃতি বিশিষ্ট চিনির সাঁচ ইত্যাদি। যুগের সাথে সাথে সেইসব জিনিস হারিয়ে গেলেও আজও অত্যাধুনিক ফাস্ট ফুডের সাথে সমান পাল্লা দিয়ে বিক্রি হয় ঐতিহ্যবাহী ভেটাগুড়ি ও বাবুরহাটের জিলিপি এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ঢাকাই পরোটা।

শুধু পণ্য কেনাবেচা বা খাবারের স্টলই নয়, মানুষজনের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন বিনোদনমূলক আয়োজন যেমন-সার্কাস, নাগরদোলা, পুতুলনাচ, ট্রয়ট্রেন, আধুনিক খেলার যন্ত্রাদি ইত্যাদির উপস্থিতি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। ঐতিহ্যবাহী টম্‌টম্‌গাড়ি আজও ছোটদের কাছে সমান চাহিদাসম্পন্ন। এছাড়াও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগীয় প্রদর্শনীমূলক স্টল, ধর্মীয় স্টল, রাজনৈতিক প্রচারমূলক স্টল এবং বিভিন্ন বেসরকারী স্টলের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। শতাধিক দোকানের সমাহার, হরেকরকম পণ্যের বৈচিত্র্য, চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাই এবং হাজার হাজার মানুষের সমাগম এইমেলার সজ্জারূপকে অলঙ্কৃত করে।

রাতের আলোকজ্জ্বল রাসমেলা প্রাঙ্গণ

কোচবিহার রাসমেলা কেবল প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক-বাহকই নয়, জনসংযোগ, লোকশিক্ষার প্রসার এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোচবিহার জেলা তথা উত্তরবঙ্গের লৌকিক কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোচবিহারের রাসমেলা।

রামানুজনের আশ্চর্য গণিত ভাবনা

রাহুল রায়
(প্রথম বর্ষ, ২০২১-২৩)

"Srinivasa Ramanujan was the strangest man in all mathematics, probably in the entire history of science. He has been compared to be a bursting supernova, illuminating the darkest, most profound corners of mathematics, before being tragically struck down by tuberculosis at the age of 33, like Riemann before him."

-Michio Kaku

ভারতে বিজ্ঞানচর্চা যে প্রাচীনকাল থেকেই আছে তা আমরা সকলেই জানি। শূন্যকে সংখ্যা রূপে ব্যবহার প্রাচীন ভারতেই শুরু হয়। আর্যভট্ট থেকে শুরু করে ব্রহ্মগুপ্ত, মাধব ইত্যাদি পন্ডিত ব্যক্তি যে বিজ্ঞানচর্চায় অসাধারণ অবদান রেখেছেন তা অনস্বীকার্য। ভারতে প্রথম গণিতচর্চার পরিচয় আমরা বৈদিক যুগের 'সুলভে সূত্র'-এ দেখতে পাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও এমন এক গণিতজ্ঞের জন্ম হয় ভারতবর্ষে। দক্ষিণ ভারতের 'কেমব্রিজ শহর' কুম্ভোকোনম, তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে ইরোড শহর, সেখানেই জন্ম হয় গণিত জগতের বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজনের। রামানুজনের ৩৩ বছরের স্বল্প জীবনকালে গণিতের বিভিন্ন শাখায় যা অবদান রেখে গেছেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে স্ট্রিং থিওরি, "signal processing problem", এমনকি স্ট্যাটিস্টিকাল মেকানিক্স, ব্ল্যাক হোল ফিজিক্সেও রামানুজনের থিওরির প্রয়োগ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ফ্রিম্যান ডাইসনের একটি অসাধারণ মন্তব্য, "রামানুজন আবিষ্কার করেছেন প্রচুর। আবার তিনি তাঁর বাগানে অন্যদের আবিষ্কার করার জন্যেও রেখে গিয়েছেন প্রচুর।" মাত্র ৩১ বছর বয়সে তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো(১৯১৮) নির্বাচিত হন। ওই একই সালে প্রথম ভারতীয় হিসাবে ট্রিনিটি কলেজের (কেমব্রিজ) ফেলো নির্বাচিত হন। জন্মসূত্রেই তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ তামিল পরিবারের একজন অতিসাধারণ বালক। কোনো রকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই এই অতিসাধারণ বালক কিভাবে অসাধারণে পরিণত হল, তাই রামানুজনের জীবনকাহিনীকে রহস্যময় করে তুলেছে।

রামানুজন ছোট থেকেই চুপচাপ শান্ত প্রকৃতির। সারাদিন অঙ্ক করা ছাড়া তাঁর অন্য বিষয়ে কোনো উৎসাহ ছিল না। কুম্ভোকোনম টাউন স্কুলে পড়ার সময় থেকেই রামানুজন শিক্ষকদের নানা প্রশ্ন করে বিভ্রান্ত করতেন। একদিন মাস্টার মহাশয় ক্লাসে বোঝাচ্ছেন তিনটি ফল যদি তিন জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে প্রত্যেকে একটি করে ফল পাবে। তেমনি যদি হাজারটি ফল হাজার জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলেও প্রত্যেকে একটি করে ফল পাবে। অর্থাৎ কোনো সংখ্যা কে যদি ওই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়, তাহলে ভাগফল এক হয়। হঠাৎ রামানুজন উঠে দাড়ায় এবং বলেন, "স্যার যদি শূন্য টা ফল শূন্য জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলেও কি প্রত্যেকে একটি করে ফল পাবে?" অর্থাৎ শূন্য কে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কি ভাগফল এক হবে!!! শিক্ষককে এই ভাবেই মাঝে মাঝে গণিতের মায়াজালে জড়িয়ে দিতেন রামানুজন।

ছোটো থেকেই যে রামানুজনের আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তা টাউন স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বোঝা যেত। রামানুজন তাঁর থেকে উঁচু ক্লাসের গণিত সহজেই করে দিতেন। রামানুজনের স্কুলজীবনে বন্ধু ছিলেন রাজাগোপালাচারী। রাজাগোপালন ছিলেন তাঁর থেকে দুই ক্লাসের বড়ো। রাজাগোপালাচারী রাজাগোপালন কে রামানুজনের প্রতিভা সম্পর্কে বলতে সে মেনে নিতে পারেন না। রাজাগোপালন বলেন রামানুজন যদি তাঁর দেওয়া একটি অঙ্ক সমাধান করে দিতে পারেন, তবে তিনি তাঁর প্রতিভা মেনে নেবেন। অঙ্কটি ছিলঃ

$\sqrt{x}+y=7; x+\sqrt{y}=11$, x ও y এই দুই অজানা রাশিটির মান নির্ণয় করতে হবে। রামানুজন তখন যে ক্লাসে পড়তেন, তাঁর পক্ষে দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু রামানুজন সমীকরণটি দেখেই বলে দিলেন x র মান 9 এবং y এর মান 4। ক্লাসে প্রায় ভিড় হয়ে গিয়েছিল, সবাই অবাক।

শুধু ছাত্ররাই না, স্কুলের শিক্ষকরাও রামানুজনের এই প্রতিভা কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। একদিন স্কুলের গণিত শিক্ষক রামানুজন কে স্কুলের ক্লাস রুটিন বানিয়ে দিতে বললেন, যাতে কেউ কম বা বেশি ক্লাস না পায়। সেই সময় রামানুজন যাদুবর্গ (Magic square) র অঙ্ক সমাধান করছিলেন। সেই ধারণা তাঁর ওই রুটিন বানাতে কাজে লেগে গেল। এখন ম্যাজিক স্কোয়ার কি? একটি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে বেশ কিছু বর্গক্ষেত্র আঁকা হবে। এবং ওই ছোটো বর্গক্ষেত্রগুলি এমন সংখ্যা দিয়ে পূর্ণ করতে হবে, যাতে উপর-নীচ বা কোনাকুনি যে ভাবেই যোগ করা হোক না কেন যোগফল সর্বদা একই হবে। পরবর্তীকালে দেখা যায় রামানুজনের নোটবইতে যাদুবর্গের উপর নানা আশ্চর্য ফর্মুলা তৈরি করেছেন।

ছোটোবেলা থেকেই দারিদ্র্যের মধ্যে বড়ো হয়েছেন রামানুজন। তাঁর গণিতের বেশিরভাগ প্রমাণ চক দিয়ে শ্লেট এ লিখতেন এবং তাঁর রেজাল্ট গুলি শুধু মাত্র লিখে রাখতেন তাঁর নোটবুকে। একটি বই-এর কথা না বললেই নয়, যা রামানুজন শুধু না বইটার জনপ্রিয়তাও বাড়িয়ে তুলেছিল পরবর্তীকালে। জর্জ কারের লেখা, "A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied mathematics" বইটিতে বীজগণিত জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, ইনট্রিগ্যাল ক্যালকুলাস, ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান সহ বিভিন্ন গাণিতিক উপপাদ্য ছিল। রামানুজন কারের বই থেকে বিভিন্ন উপপাদ্য পড়তেন, সেগুলি নিজের মতো করে লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি নিজের অজান্তেই কত নতুন উপপাদ্য তৈরি করে ফেলতেন, কিন্তু তা হয়তো

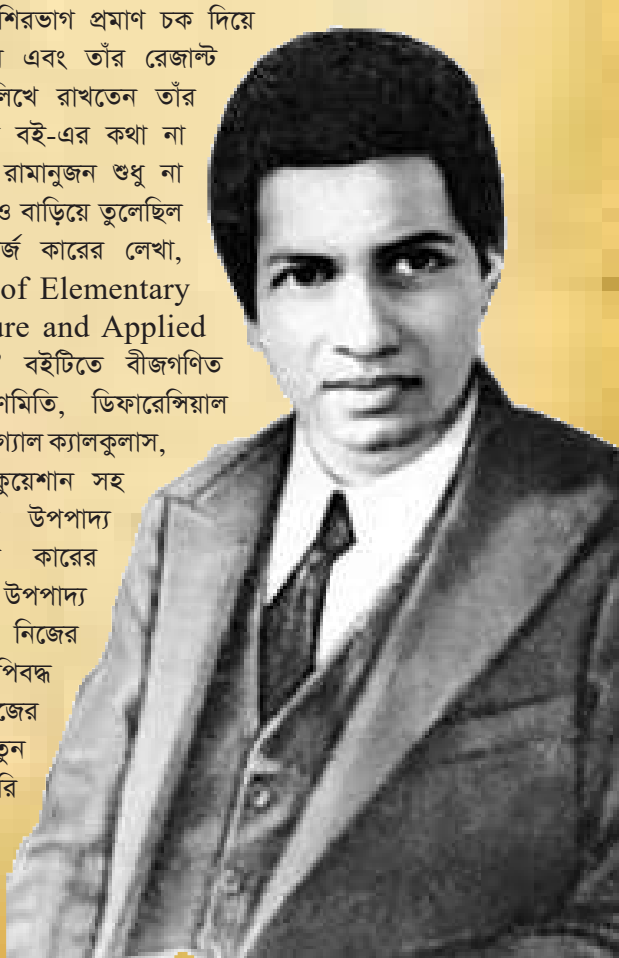

অতীতেই প্রমাণ হয়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে Michio Kaku বলেছেন, "In every young scientists life, there is a turning point, a singular event that helps to change the course of his life. For Einstein, it was the fascination of observing a compass needle. For Riemann, it was reading Legendre's book on number theory. For Ramanujan, it was when he stumbled on an obscure, forgotten book on mathematics by George Carr."

ম্যাট্রিক পাস করে তিনি গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হন। ক্লাসে উপস্থিতির সংখ্যা কমের কারণে তিনি পরীক্ষায় বসতে পারেন নি। পরে পাচাইয়াপ্পা কলেজে ভর্তি হন, তবে সেখানেও গণিত ছাড়া অন্য বিষয়ে সাফল্য আসে নি। একটা পরীক্ষাই কি রামানুজনের প্রতিভা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট! না। রামানুজন তাঁর গণিতচর্চা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখেন। ১৯১১ সালে তিনি ইন্ডিয়ান ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটিতে প্রথম রিসার্চ পেপার পাবলিশ করেন " Some properties of Bernoulli's number" নামে। ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে মোট তিনি চারটি পেপার পাবলিশ করেন। পরে গণিতের বিভিন্ন কাজ ভারতের কিছু গণিতজ্ঞ কে দেখান কিন্তু কেউই তাঁর কাজ বুঝতে পারেননি। তিনি হেনরি ফ্রেডেরিক বেকার ও আর্নেস্ট উইলিয়াম হবসন কে তাঁর গাণিতিক কাজ ব্যাখ্যা করে চিঠি লেখেন। রামানুজন দুজনের থেকেই কোনো উত্তর না পেয়ে কিছুটা হতাশ হলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে পরবর্তী কালে দুজনেই রামাজুনের নাম রয়াল সোসাইটির ফেলো হিসাবে প্রস্তাব করেছেন। অবশেষে তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক জি এইচ হার্ডির কাছে চিঠি লেখেন। তাঁর দীর্ঘ চিঠিতে গাণিতিক কাজ গুলিও লিপিবদ্ধ করেন। সেখানে তাঁর হাইপারজিওম্যেট্রিক সিরিজ, ডাইভারজেন্ট সিরিজের, ইলিপটিক ইনট্রিগ্যালর র উপর কাজগুলি উপস্থাপনা করেন।

হার্ডি তাঁর ডাকে সারা দিয়ে তাঁকে কেমব্রিজে ডেকে নিলেন। রামানুজন-হার্ডি যুগলবন্দী রামানুজনের গনিত প্রতিভাকে বিশ্বের কাছে মেলে ধরার সুযোগ করে দিল। রামানুজন ট্রিনিটি কলেজে মোট পাঁচ বছর (১৯১৪ খ্রিঃ-১৯১৯ খ্রিঃ) অতিবাহিত করেছিলেন যা ছিল রামানুজনের জীবনে স্বর্ণযুগ। এই সময় তিনি মোট ২১ টি রিসার্চ পেপার পাবলিশ করেন। রিসার্চ পেপার গুলি মূলত ছিল ডেফিনাইট ইন্টিগ্র্যাল, মডিউলার ইকিউয়েশন, রিম্যান জিটা ফাংশন, নাম্বার থিওরি, অসীম শ্রেণী, অ্যাসিমটোট ফরমুলা ও পার্টিশন থিওরি উপর। ১৯১৫ সালে তিনি ৬২ পাতার একটি পেপার পাবলিশ করেন " Highly composite number " নামে, যা ছিল তাঁর দীর্ঘতম পেপার।

রামানুজনের কেমব্রিজ আসার প্রথমার্ধেই পরিচয় হয় ভারতের এক রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ র সাথে। তিনি কিংস কলেজে পদার্থ বিভাগের ছাত্র ছিলেন। কিংস কলেজের অধ্যাপক আর্থার বেরি একদিন "elliptic integrals" র উপর ক্লাস নিচ্ছিলেন। ক্লাসে রামানুজনও উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ রামানুজন কিছু বলতে চাইছেন। আর্থার বেরি তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বোর্ডে এসে এমন কিছু সমীকরণ লিখে দিলেন যা আর্থার বেরি তখনও প্রমাণ করে দেখান নি। এইরকম বেশিরভাগ সময়ই তিনি নিজের ইনটিউশন থেকে অনেক গানিতিক ফর্মুলা বলে দিতে পারতেন। এখানই ছিল রামানুজনের গনিতের প্রতি আশ্চর্য ক্ষমতা।

প্রায়ই প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ ও রামানুজন প্রাতঃ ভ্রমনে যেতেন। তাদের মধ্যে কথা হতো বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে। শূন্য ও অসীম নিয়ে তাঁর দার্শনিক ভাবনা প্রশান্ত চন্দ্রের কথায় ধরা পরে। হিন্দু পুরাণে নির্গুণ ব্রহ্মার যে ধারণা আছে, রামানুজন শূন্যকে তাঁর সাথে তুলনা করতেন। "অসীম সংখ্যা" কে তিনি সমস্তরকমের সম্ভবনার সমষ্টি রূপে ভাবতেন। রামানুজনের মতে অসীম সংখ্যা ও শূন্যের গুনন থেকে সসীম সংখ্যাবলীর সজ্জা পাওয়া যায়। রামানুজন বলতেন, "An equation for me has no meaning unless it express a thought of GOD."

একদিন রামানুজন মহালনবিশকে নৈশভোজের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মহালনবিশ রামানুজনের বাড়ি যাওয়ার পূর্বে একটি 'Strand Magazine' কিনেছিলেন। সেখানে তিনি একটু মজার ধাঁধা পেলেন। নিজে অনেকবার trial and error র মাধ্যমে সমাধান করেছিলেন। মহালনবিশ মজার ছলে রামানুজনকে বললেন, "এই নাও, তোমায় একটা প্রবলেম দিচ্ছি।"

রামানুজনঃ "কী প্রবলেম?" (সবজি রান্না করতে করতে)

প্রবলেমটি ছিলঃ কোনো এক রাস্তার ধারে 1,2,3.....n টি বাড়ি ছিল। বাড়ির সংখ্যা 50 থেকে 500 র মধ্যে। $(50 < n < 500)$ এখন ওই বাড়িগুলোর মধ্যে থেকে একটি বাড়ি বেছে নিতে হবে, যাতে বাড়ির আগের বাড়ি গুলির নম্বরের যোগফল ও পরের বাড়িগুলোর নম্বরের যোগফল সমান হয়। তাহলে ওই বাড়িটির (x) নম্বর কত?

বাড়িটির নম্বর হবে 204 এবং মোট বাড়ির সংখ্যা 288. অর্থাৎ 1+2+3...203 = 205+206....288

কিন্তু রামানুজন যে সমাধানটি দিয়েছিলেন তা ছিল একটি ক্লাস ওফ প্রবলেমের সমাধান।

রামানুজনঃ "Take down the solution." তিনি একটি ক্রমান্বিত ভগ্নাংশে উওর টি দিলেন। সেই অসীম ক্রমান্বিত ভগ্নাংশের একটি একটি করে পদ যোগ করতে থাকলে ওই ধাঁধার বিভিন্ন সমাধান গুলি পাওয়া যায়। মহালনবিশ তাঁর সমাধান দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে সে এই সমাধানটি পেলেন।

রামানুজনঃ "Immediately I heard the problem, it was clear that the solution was obviously a continued fraction, I then thought 'which continued fraction?' and the answer come to my mind. It was just as simple as this."

বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে খেলাই ছিল রামানুজনের প্রধান বিনোদন। তিনি π র মান নির্ণয়ের জন্য অনেক গুলি অসীম শ্রেণী তৈরি করেন। তার মধ্যে একটি অসীম শ্রেণীর প্রথম দুটি পদ যোগ করলে π র মান 14 দশমিক পর্যন্ত সঠিক নির্নয় করা সম্ভব। তিনি বৃত্তের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করেছিলেন যা থেকে π র মান ছয় দশমিক পর্যন্ত সঠিক নির্নয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি সমাকলন কে বিভিন্ন ক্রমিক ভগ্নাংশ দিয়ে লিখতেন। ফিবোনাচ্চি সিরিজ কে উল্টো ভাবে ব্যবহার করে নানা আকর্ষণীয় ও মৌলিক তথ্য বের করেছিলেন। এই সংখ্যা নিয়ে রামানুজনের জীবনে অনেক মজার ঘটনা আছে। ইংল্যান্ডে রামানুজন যখন অসুস্থ, তখন তাঁকে দেখতে আসেন জি এইচ হার্ডি। তিনি যেই ট্যাক্সি চেপে আসেন, তার নম্বর ছিল 1729, হার্ডি নম্বরটি সম্মন্ধে বলেন, "seemed to me rather a dull one." কিন্তু রামানুজনের কাছে এই নম্বরের কোনো ব্যাখ্যা থাকবে না, তা কি করে হয়!

রামানুজনঃ "No, it's very interesting number, it is the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different ways." অর্থাৎ $1729=10^3+9^3=12^3+1^3$...

1729 ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যা দুভাবে দুটি ধনাত্মক সংখ্যার ঘন রূপে প্রকাশ করা সম্ভব। 1729 সংখ্যা টি রামানুজন র নোটবই তে উল্লেখ নেই তবে $10^3+9^3=12^3+1^3$ সম্পর্কটি তার নোটবই ও ইন্ডিয়ান ম্যাথেম্যাটিক্যাল সোসাইটির জার্নালের তাঁর পেপারে উল্লেখ পাওয়া যায়।

$x^3+y^3+z^3=u^6$ এই সম্পর্ক টি র পূর্ন সংখ্যার সমাধানের একটি সমাধান এরমঃ $12^3+(-10)^3+1^3=3^6$...

তাঁর নোটবই তে একটি উপপাদ্য উল্লেখ করা আছে: $a^2+ab+b^2=3cd^2$ হলে

$(a+c^2d)^3+(cb+d)^3=(ca+d)^3+(b+dc^2)^3$ হবে। এখন $a=3$, $b=0$, $c=3$, $d=1$ বসালে উল্লেখিত গাড়িটির নম্বর সংক্রান্ত সমাধান

পাওয়া যায়। অর্থাৎ $12^3+ 1^3 = 10^3+9^3 = 1729$। জে ই লিটিলউড রামানুজন সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন "Every positive integer was one of Ramanujan's personal friends." 1729 হার্ডি-রামানুজন নম্বার নামে পরিচিত।

হার্ডি রামানুজনকে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অয়লার ও জেকোবি র সাথে তুলনা করতেন। হার্ডি বলতেন, " My association with Ramanujan is the one romantic incident in my life"। পরবর্তী কালে Bruce carl Berndt, থেকে শুরু করে Freeman Dyson অনেকেই তাঁর কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। Paul Erdos I Mark Kac রামানুজনের গবেষণাপত্র পড়ে এমন কিছু প্রবন্ধ লিখলেন যা সম্ভাবনাময় সংখ্যাতত্ত্বের সূচনা করে। রামানুজনের বিখ্যাত "Tau Conjecture" ১৯৭৪ সালে প্রমান করেন বেলজিয়ামের গণিতজ্ঞ পিয়েরি ডেলিন। এই কৃতিত্বের জন্য ডেলিনকে "Fields Medal" দেওয়া হয়। Bruce Berndt রামানুজনের সকল কাজ 'Ramanujan's Notebooks' নামে পাঁচটি খন্ডে প্রকাশ করেন। ট্রিনিটি কলেজের লাইবেরি থেকে রামানুজনের হারিয়ে যাওয়া অনেক পেপার সংগ্রহ করেন জর্জ অ্যানড্রিউজ। তিনি রামানুজনের এই হারিয়ে যাওয়া পেপার গুলি একত্রে 'Ramanujan's Lost Notebooks' নামে প্রকাশ করেন। Freeman Dyson তাঁর একটি article "A walk through Ramanujan's Garden" এ বলেন, " Ramanujan's paper are not only a good therapy for headaches, they also are full of beautiful ideas which may help you to do more interesting mathematics."

আরো জানতেঃ

1) "The man who knew infinity :A life of a Genius Ramanujan" - Robert kanigel.
2) "গণিতের জগতের বিস্ময় রামানুজন" - সত্যবাচী সর
3) "Ramanujan: Essays and Surveys"- Bruce C. Berndt .
4) "গণিত প্রতিভা শ্রীনিবাস রামানুজন" - শ্যামল চক্রবর্তী

বাবা-ছেলের যে সংলাপ হওয়া উচিৎ হয়নি

অর্কপ্রভ শীল
(প্রথম বর্ষ, ২০২১-২৩)

ছেলেঃ আর কত পথ বাবা? আর কত দিন?
সুদীর্ঘ রাস্তা, অন্ত ধোঁয়াশায় বিলীন।
আজ দিয়ে সাতদিন হেঁটেই চলেছি,
কখনো পা অসাড়, কখনো বা টলেছি।
শেষ খাওয়া গত সন্ধে, এখন রাত,
বারোজন হাঁটছিলাম, এখন সাত।
উত্তর দাও বাবা, মুখে উত্তর দাও।
চুপ করে থেকে বাবা কী আনন্দ পাও?

বাবাঃ আনন্দ নয় রে ছেলে, আমি নিরুপায়।
নিজের সন্তানের সুখ কেই না চায়?
সেই জন্যই তো ছেড়েছিলাম রে বাড়ি
ভিনদেশে অভাগা দিয়েছিলাম পাড়ি।
সুখ কপালে না থাকুক, ভাত তো ছিলো,
কোন এক রোগ এসে তাও কেড়ে নিলো।
শেষ মাসে মাইনে দিলো না মালকিন
অসহায় আমি আজ, তাই গৃহহীন।

ছেলেঃ তবে কেন শুধু আমরা? বলো কী দোষ?
জগতে সব দুঃখ, সব আফসোস
কেন শুধু আমাদেরউ কপালে জোটে?
বাকি সবার মাথায় ভাগ্য-পদ্ম ফোটে?

বাবাঃ দোষ নয়, হয়ত গতজন্মের পাপ
গরিব ঘরে জন্মালি-এই অভিশাপ।
হোস যদি রাজপুত্র, ভাগ্য থাকে সাথে
মনিবের ছেলে তাই থাকে দুধেভাতে।
আমি হতভাগা রে, আমিই অপারক,
তাই শুধু আশা করি তোর সুখ হোক।
এ জীবন উতরে গেলে ভুলে যাস না
আর যায় হোক তবে গরিব জন্ম না।

The World Through The Eyes of a Corona Virus

Mariom Mamtaj
(1st year, 2021-2023)

His wonky nose tickled a bit. And with a sudden, violent and spasmodic expiration of breath, I was carried away. The next thing I knew, I landed, as far as 6 feet. On the grey toothbrush moustache of a friend of the old man. You see, viruses do not have much of a choice when it comes to where we are being spread to.

"The district has reported a high quantum of average daily new cases in the week…", the old man started prattling on. His gruff voice became softer and softer until vaguely audible as I made my way through the long respiratory tract of the human body - a vision of pulsing colours and flowing forms.

Later, that evening, at the dining table, the man felt uneasy. I could hear his wife and children worrying. Fear of mistakes can cripple people in no time. "Fear is a shackle, a slowly twisting knife in the gut, a constant hammer on the head." I believe fear gives us second chances too. Fear leads one to take stock of life's journey. This includes reflecting on where one is, his personal vision for the future and pondering over what matters the most.

The sick man beat a retreat back to the sofa. His head split and he felt shivering and feverish. The doctor gave him medicine for three days. It started raining and the drizzles of rain and wind started playing hide and seek. The sound of raindrops splashing against the window panes made him all the more fidgety. Life can sometimes make unexpected turns from purple afternoons of the ignorant to pitch-black nights of the conscience-stricken.

For the rest of the evening, I felt too mortified to get on. A couple of days later, he tested positive for the disease, not to be named. More symptoms started kicking in. He quarantined himself in his little room, where he spent days agonising over his mistake, occasionally reading a book sitting on the couch and sometimes doing absolutely nothing and letting his mind travel unencumbered to many happy moments from the past. Of times he walked down the local market on a beautiful September's day, or on a mildly overcast day of August.

Under the weight of things unknown and unseen, he thought about life for at least once in his entire life. Often starting to move around the little room, stopping to consider thoughts that haven't crossed his mind before. Things falling apart is a kind of testing and healing too. He became increasingly keen on self care, from starting the day with meditation to making healthy choices about food and balancing his work and non-work hours.

The family started seeing good changes by the end of a week and I knew my time had come. Before long, I was out in the daylight one day, at the hour of golden sunrise, ushering in new opportunities for those who kept hoping. It was time that we remembered, "even the darkest night will end and the sun will rise". Light poured in through every nook and corner of the house. There was a sound of inexplicable joy and laughter while darkness closed in for me.

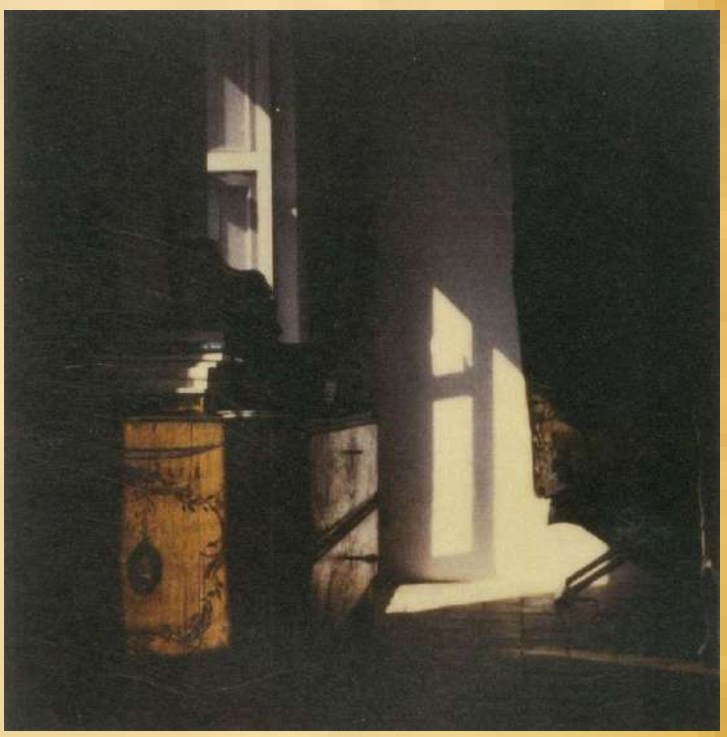

গড়িয়াহাট সংহতি ইশকুল

ঋক্ ধর্মপাল বন্দোপাধ্যায়
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

উন্মেষের প্রচ্ছদে একটি বাচ্চার ছবি আছে। ও ইশকুল খোলার দাবী তুলেছে। এটি একটি রাজনৈতিক দাবী। লোকজনকে মাঝেমধ্যেই বলতে শুনবেন, "বাচ্চাদের রাজনীতিতে টানবেন না।" এটা রাজনৈতিক ভাবে একটি চূড়ান্ত সুবিধাবাদী বাক্য। অনেকে রাজনীতি বলতে সংসদীয় রাজনীতি ব্যতীত কিছু বোঝেন না, বুঝতে শেখেননি। অনেকে আবার বোঝেননা যে কিছুই অরাজনৈতিক নয়। বুঝতে শেখেন নি। অরাজনৈতিক থাকার ঢং করা মানে সেফ খেলা। শিশুকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার কারণ হিসাবে অনেকে তার বোধশক্তির জাগরণ না হওয়াকে দেখায়। তারাই আবার সেই শিশুকে ধর্মের পাঠ দেয়। বয়সে বড়ো মানুষদের চোখ কান বুজে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। ইত্যাদি। এগুলোও রাজনীতি। প্রশ্ন না করতে শেখার রাজনীতি। তাই প্রচ্ছদের বাচ্চাটা একটু আলাদা। সে প্রশ্ন করেছে। "ইশকুল কেনো বন্ধ? ইশকুল খুলে দাও। শিক্ষার অধিকার আমার মৌলিক অধিকার। আমার শিক্ষা কেন বন্ধ? ইশকুল খুলে দাও। আমার কাছে মোবাইল কেনার মতো, দৈনন্দিন ইন্টারনেট প্যাক খরিদ করার প্রিভিলেজ নেই। শিক্ষা কি শুধু উচ্চবিত্তদের জন? ইশকুল খুলে দাও।"

মোটামুটি একটা ভূমিকা গেলো। ভূমিকায় একটা গুরত্বপূর্ণ শব্দ আছে। মৌলিক অধিকার। ভারত খাতায় কলমে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতের একটি সংবিধান আছে। সংবিধান, খাতায় কলমে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে কিছু মৌলিক অধিকার প্রদান করে। আবার সংবিধানই মানুষের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করার সুযোগ প্রদান করে বটে! আপাততঃ অধিকারপ্রদানের প্রসঙ্গেই থাকি।

ভারতীয় সংবিধানের Magna Cartaএ ছয়টি মৌলিক অধিকারের কথা আলোচিত আছে। আর্টিকেল ২১ এ "Right to life and personal liberty"র কথা বলা আছে। আর্টিকেল ২১-A তে Right to Education-এর কথা বলা হয়েছে। আর্টিকেল ২৩ এবং ২৪ শোষণের বিরুদ্ধে, শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে অধিকারপ্রদানের কথা বলে ॥ সংবিধান নিয়ে আলোচনা শুরু করলে তা শেষ হয়না। যৎসামান্য কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করলাম। এর মধ্যে আর্টিকেল ২১টি বেশ আকর্ষণীয়। সুপ্রীম কোর্ট এটিকে "মৌলিক অধিকারসমূহের হৃদয়" বলে উল্লেখ করেছিলো। খুব কম কথায় এর মধ্যে কীকী পড়তে পারে তা উল্লেখ করছি। সম্মানজনকভাবে বাঁচার অধিকার, পরিষ্কার এবং শুদ্ধ জলহাওয়াযুক্ত পরিবেশে থাকার অধিকার, সুরক্ষার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার (RTE 2009), বিনামূল্যে আইনী সহায়তা পাওয়ার অধিকার, অমানবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে অধিকার, সরকারী হাঁসপাতালে দ্রুত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার, তথ্যের অধিকার (RTI), বিদ্যুতের অধিকার ইত্যাদি। আদালতের বিভিন্ন জাজমেন্টে বহু বছর ধরে এই অধিকারগুলির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, আরও আসবে। এছাড়া, আর্টিকেল ৪৫এর কথাও অবশ্যই বলে রাখা উচিত যেখানে রাষ্ট্রকর্তৃক ৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুর পড়াশুনার দেখভাল করার কথা বলা আছে।

আসুন, সোজা উড়ে চলে আসি গড়িয়াহাট উড়ালসড়কের নীচে। বহু দশক ধরে এখানে মানুষ থাকে। রাস্তায় থাকে। এখন প্রায় ২০০ জন মানুষ থাকে। কাগজ কুড়োয়। রাস্তার দোকানে কাজ করে। মাল বয়। রিকশা চালায়। নর্দমা পরিষ্কার করে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফাইফরমাশ খাটে। ভিক্ষা করে। এবং রাস্তায় থাকে। আমি নিজে গড়িয়াহাটের বাসিন্দা। তাই আজ আপাততঃ এদের কথাই বলবো।

উপরে সংবিধানের কথা বিশেষ কারণেই উল্লেখ করেছি। দাঁড়িপাল্লার একপাল্লায় সংবিধানের ঐ বুলিগুলোকে রাখুন, আরেক পাল্লায় গড়িয়াহাট উড়ালসড়কের নীচে বাসরত একজন কাগজকুড়ুনি পথবাসীকে রাখুন। দেখবেন, মজাদার লাগবে! যাইহোক, সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে লেখার পরবর্ত্তী অংশে প্রবেশ করি!

কলকাতা শহরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ রাস্তায় থাকে, ঝুপড়িতে থাকে,বস্তিতে থাকে। এদের জীবনে সংবিধানে উল্লেখিত সম্মানটা নেই। তবু এরাই শহরটাকে বাঁচিয়ে রাখে। পেটের দায়ে দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে বাঁচিয়ে রাখে।

কোভিড যখন প্রথম ভারতে আসে, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতজুড়ে লকডাউন ডাকে। অবশ্যই গরীবদের কথা না ভেবেই ডাকে। সারা দেশ জুড়ে হাজারে হাজারে পরিযায়ী শ্রমিকের কী অবস্থা সেই সময়ে হয়েছিলো আমরা দেখেছি। আশা করি ভুলিনি। ভুললেও অবাক হবোনা। ওটাই আমাদের শ্রেণীচরিত্র। গড়িয়াহাটার মানুষদেরও রুটিরুজির পথ বন্ধ হয়ে যায়। এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় স্কুল কলেজ। যে বাচ্চাগুলো হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতো, প্রত্যেকে ফিরে আসে। শিক্ষার ন্যূনতম ছোঁয়া থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পড়ে সম্পূর্ণভাবে। এরই মধ্যে নির্লজ্জের মতো শুরু হয় অনলাইন শিক্ষা। দুর্ভাগ্যবশতঃ, যারা রাস্তায় থাকে তাদের প্রতিদিন ইন্টারনেট প্যাক কেনার ভাগ্য থাকেনা। উচ্চশিক্ষা ভারতে সর্ব্বদাই উচ্চবিত্তেরই ছিলো। মৌলিক শিক্ষাও তাই হয়ে গেলো। রমরমিয়ে শুরু হলো বড়োলোকের লকডাউন।

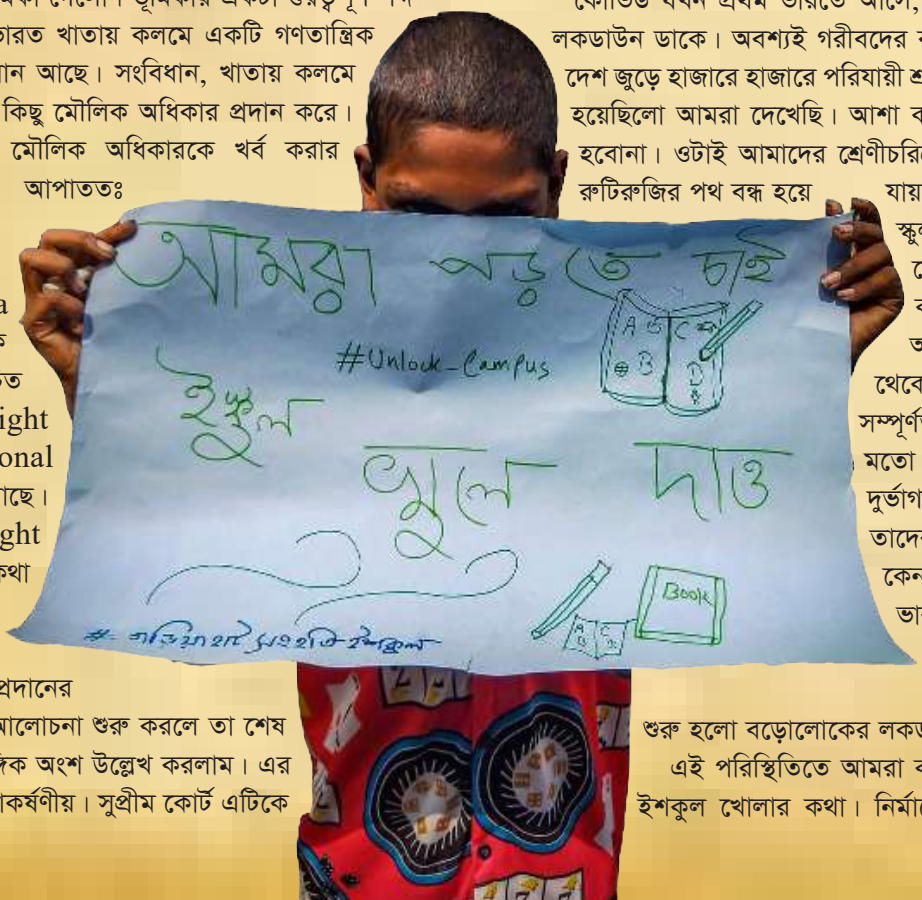

এই পরিস্থিতিতে আমরা কয়েকজন মিলে ঠিক করলাম ইশকুল খোলার কথা। নির্মাণের রাজনীতির কথা। টালা

ব্রীজের নীচের মানুষদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বস্তিবাসী শ্রমজীবী অধিকার রক্ষা কমিটি দীর্ঘকাল ধরে লড়াই চালাচ্ছিলো। আমাদের সবার প্রিয় রায়াদির স্মৃতিতে সেখানে প্রথম খোলা হলো রায়া'র পাঠশালা - টালা সংহতি ইশকুল। গড়িয়াহাটেও কুড়োনো কাগজের দাম পাওয়া নিয়ে একটি আন্দোলনে কিছু যোগাযোগ ছিলো। এছাড়া, স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে আমার কিছুমাত্রায় পূর্ব্বপরিচয় ছিলো গড়িয়াহাট ব্রীজের নীচের মানুষদের সাথে। আমি ঠিক করলাম, এখানেও খুলবো সংহতি ইশকুল। একদিন আমি আর সৌম্যদা, ঐ সংগঠনেরই এক বন্ধু, ব্রীজের নীচে দাবাড়ুদের ঠেকে বসে একটু আলোচনা করলাম, ওখানকার মানুষদের সঙ্গে ইশকুল খোলার বিষয় নিয়ে, গিয়ে গিয়ে কথা বললাম। এপ্রিলেই কিছুদিন পর, পরের রবিবারেই শুরু হয়ে গেলো গড়িয়াহাট সংহতি ইশকুল।

সংহতি শব্দের মধ্যে ইশকুলের রাজনীতিটা রয়েছে। সংহতি জানানো। অর্থাৎ, পাশে থাকা। লড়াইতে পাশে থাকা। পথবাসী মানুষদের হকের দাবী ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াইতে পাশে থাকা।

আমরা NGO নই। এবং, আমরা NGO বিরোধী। গড়িয়াহাট একটা পশ অঞ্চল। প্রতিদিন ব্রীজের নীচে একাধিক NGO আনাগোনা করে। লকডাউনে এদের আনাগোনা আরও বেড়ে গেছিলো। শহুরে ছেলেমেয়েরা ঝকমকে জামা পরে দান করতে আসে। লাইন করে ওদের দাঁড় করিয়ে ত্রানসামগ্রী দেয়। দিতে দিতে সেল্ফি তোলে,লাইভ করে। মাল শেষ হয়ে গেলে গাড়ি করে বেরিয়ে যায়। সবাই না পেলেও ওদের ক্ষতি নেই। কেউ পায়নি বলে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি রক্তারক্তি হলেও ওদের ক্ষতি নেই। ফান্ডের টাকা ব্যবহৃত হয়ে গেছে,ছবি উঠে গেছে। আপাততঃ কাজ শেষ। পগার পার। কিছু ব্যতিক্রমী দল বাদে, NGOর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। সরকার যা করেনা, NGOরা তা করে দেয়। সুপরিকল্পিতভাবে ওরা সরকারের অপদার্থতাকে ভুলিয়ে রাখে। মানুষের লড়াইতে সম্পৃক্ত হওয়ার দায় NGOদের নেই। ওদের দায় শুধু মাসের শেষে হিসাব দেখানোর। NGOরা ভিক্ষা দেয়। আমি আপনিও ভিক্ষা দি। পথেঘাটে ভিক্ষা দি। ভিক্ষা দিয়ে নিজেদের মহান ভাবি। অনেকে টাকা না দিয়ে কিছু কিনে দিয়ে ভাবে ভিক্ষা দিলামনা। শুধু টাকা দিলে নেশা করতো, আর করবেনা। সেও ভিক্ষাই দিলো। অন্যরূপে। ভিক্ষা দিয়ে নিজেকে মহান ভাবলো। ভিক্ষা দেওয়া অপরাধ। ভিক্ষাদান মানুষের অধিকারবোধকে হত্যা করে। মানুষকে ভিক্ষারত অবস্থায় থাকতে উৎসাহিত করে। (মানুষকে এই অবস্থায় রাখার প্রয়োজনীয়তাও আছে বটে! সুপরিকল্পিতভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর মানুষকে রাস্তায় রেখে দেওয়া হয়। কাগজকুড়ুনিরা না থাকলে কাগজ কুড়োবে কে? নর্দমার বিষাক্ত শমনরূপী জলে নামার কেউ না থাকলে পরিষ্কার করবে কে?) সর্ব্বোপরি তারা রাষ্ট্রের অপদার্থতাকে ঢেকে রাখতে সাহায্য করে। ভিক্ষা দেওয়া অপরাধ।

সংহতি ইশকুলের ক্লাস কীভাবে শুরু হতো, আজ কীভাবে সপ্তাহে প্রতিদিন দুইবেলা ক্লাস হয়, কত মানুষ যুক্ত, কতরকমের ক্লাস হয়, কীভাবে বাচ্চারা আজ নিজেরাই পরিপাটি হয়ে চুল আঁচড়ে স্নান করে সেজেগুজে প্রস্তুত থাকে ইশকুল শুরুর অপেক্ষায় ; দাদাদিদিরা এলেই "দাদা,পড়বো! দিদি,পড়বো!" ছুটে চলে আসে লেখাপড়া করতে, একদিন ক্লাস না হলে মুখ ফোলায় অভিমানে ইত্যাদি নিয়ে এইখানে আলোচনা করবোনা। এই মেলবন্ধনের গল্প এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। রঙীন অধ্যায়। এমনিই লেখাটা বেশ বড়ো হয়ে যাচ্ছে লিখতে লিখতে। আজ মূলতঃ ঘুরপাক খাচ্ছি সংহতি ইশকুলের ধারণা নিয়ে।

ইশকুলের ছাত্র সবাই। ছোট বড়। বাচ্চা মা বাবা। সবাই। প্রথমেই বলেছিলাম, আমরা বাইরে থেকে এসে ইশকুল খুলে সাহায্য করতে আসিনি। আমরা সাহায্য করার কেউ নইও। আমি আপনি প্রতিনিয়তঃ দেখছি এক শ্রেণীর মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে। ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের প্রাপ্য অধিকার। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকশ্রেণীর মানুষদের অধিকারবোধ জাগরিত হওয়ার বিশেষ সুযোগ থাকেনা বহুক্ষেত্রে। সারাদিন খাটিয়ে, রাতে রাষ্ট্রের যোগান দেওয়া সস্তার নেশাদ্রব্য খরিদ করে, আবার পরেরদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে অধিকারবোধ নিয়ে ভাবার সময় থাকেনা বহুক্ষেত্রে। এই শ্রেণীবৈষম্যভিত্তিক অবিচারে আমরা এই মানুষদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সংহতি জানাই। তাই সংহতি ইশকুল। এখানে বড়দেরও ক্লাস হয়। তারা সংবিধান সম্বন্ধে শেখে,আইন কানুন সম্বন্ধে শেখে। বাচ্চাবড়ো সবাই শেখে যে যখনতখন যেকেউ এসে তাদের ছবি তুলে যেতে পারেনা,সেটা ক্রাইম। তারা শেখে

পুলিশ আর পৌরসভার লোক যখনতখন এসে তাদের লাঠিপেটা করতে পারেনা, তাদের যৎসামান্য স্থাবর সম্পত্তিটুকুও নষ্ট করে ফেলতে পারেনা (এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলতেই হচ্ছে! শিবুর বয়স এখন ১৬। শিবু ব্রীজের নীচেই থাকে, ৪-৫ বছর বয়স থেকেই ডেনের নেশা করে ; মারাত্মক নেশা। তাই ছোটো থেকেই আনমনে যখনতখন যেখানেসেখানে ঘুরে বেড়াতো সে। লকডাউন যখন প্রথম পড়লো, আইন হলো মুখোশ না পরে রাস্তায় বেরুনো যাবেনা কোনোমতেই। আর যাদের মুখোশ কেনার টাকাটুকুও নেই? সে

যাইহোক, শিবু এতকিছু জানেনা বোঝেনা। সে নিজের মনেই ঘুরেফিরে ধূপ বেচতো। একদিন গড়িয়াহাট মোড়ে মুখোশ না পরার অপরাধে শিবুকে পুলিশ পেটায়। পুলিশ শিবুর পাছায় এত জোরে লাঠি মারে যে ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। হাঁটতে পারেনা, কথা বলতে পারেনা, হাত নাড়াতে পারেনা। আমি আপনি মুখোশ ছাড়া বেরুলে পুলিশ কি আমাদের পাছায় লাথাবে? সন্দেহ জাগে।) পুরুষ পুলিশ পারেনা মহিলার গায়ে কালশিটে ফেলে দিতে। আমরাও সংহতি ইশকুলের ছাত্র। আমরা প্রতিদিন ওদের থেকে শিখি। সব হারিয়েও লড়াই করে বাঁচতে শেখার পাঠ। বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা একটা বেশ বড় শব্দ। আমি নিজে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী। শিক্ষাদান সরকারের কাজ। সরকার ব্যর্থ। আমাদের কাজ সরকার যা করছেনা, তা করে দেওয়া নয়। উলটে সরকারকে চাপ দেওয়া। তাই সংহতি ইশকুলের পুঁচকে ছাত্ররাই ইশকুল খুলে দাও প্ল্যাকার্ড লিখে রাস্তায় নামে। প্রচ্ছদের বাচ্চাটার মতোই। সংহতি ইশকুলের বড়রা স্বল্পমূল্যে ক্যান্টিন দেওয়ার দাবী লিখে, র‍্যাশন বাড়ানোর দাবীতে, সবাইকে ভ্যাক্সিন দেওয়ার দাবীতে, মানবিকভাবে বাঁচার

দাবীতে প্ল্যাকার্ড লিখে গড়িয়াহাট বাজারের সামনে মাইক নিয়ে পথসভা করে, পুলিশ গুণ্ডামি করে গেলে চিঠি লিখে সুষ্ঠুভাবে থানায় নালিশ দায়ের করতে যায়,মানবাধিকার কমিশানে মেইল করে (প্রসঙ্গতঃ বেশ কিছুবার থানাযাত্রার পর পুলিশের পিটুনি বেশ কিছুমাস ধরে সম্পূর্ণ স্থগিত), ইয়াসের সময়ে সরকারি পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ অব্যবস্থা প্রদর্শিত হলে দল বেঁধে ওয়ার্ড অফিসে যায়। যেই ব্যবস্থায়, আবশ্যিক পাঠসমূহ সরকারিভাবে কখনোই দেওয়া হবেনা, সেই ব্যবস্থা আমূল পাল্টানোর লক্ষ্য এবং যতদিন সেই পচনশীল ব্যবস্থাই টিকে আছে,ততদিন অধিকারবোধের সেইসকল পাঠের পরিবেশ বানিয়ে শিক্ষাকে অস্ত্র বানিয়ে তোলা গড়িয়াহাট সংহতি ইশকুলের রাজনীতি। সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি।

অশনি সংকেত

তন্ময় আচার্য্য
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

বাঙালী মানেই তন্ময় চিন্তাধারায় শক্তিশালী। বাঙালী মানেই সংস্কৃতি মনস্ক, অত্যন্ত নিপুণ একটা জাতি। মূলত চারুকলা, সংগীত, সিনেমা, উপন্যাস ও কবিতা সংস্কৃতি নিয়েই বাঙালীর অধ্যয়ন। তবে বাঙালীদের কথা বলতে গেলে যেটা সবার আগে আসবে তা হল এরা অনেকে একত্রিত হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু গল্প করেই সময় কাটিয়ে দিতে পারে। খেলা, বিনোদন, রাজনীতি বা যেকোনো বিষয়েই এরা সমানভাবে সাবলীল।

এই তো গত রবিবার সকাল। বসাক কাকার চায়ের দোকানে পাড়ার সব বিদ্যজনেরা বসে আড্ডা দিচ্ছে। পাকা রাস্তার পাশেই চায়ের দোকান। দুপাশে দুটো দুটো করে চারটি বেঞ্চ পাতা আছে। প্রতিটি বেঞ্চে একটি করে খবরের কাগজ। পাশে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে মুখার্জীদা হেডলাইনস্-এ দেখলেন বড়ো বড়ো করে লেখা এবছর আরো বৃষ্টি হবে। "বন্ধুগণ" এবছর আরো বৃষ্টি হবে।"-বলে উঠলেন মুখার্জী দা। পাশ থেকে সুবীরদা বলে উঠলেন বলো কি হে, আরো বৃষ্টি মানে তো বন্যা। ঠিক তাই। এবছরে এখনও পর্যন্ত যা বৃষ্টি হয়েছে তা গত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি। আর যদি বৃষ্টি হয় তবে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। স্বাভাবিকভাবেই বন্যা শব্দটা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। কেউ বলছে আমাদের এখানে বন্যা হলেও রাস্তায় জল দাড়াবে না। খাল-বিল অনেক আছে তাই জল সব এগুলোতে গিয়ে জমা হবে। আবার কেউ বলছে এবছর বাড়ির দোতলাটা কমপ্লিট করতে পেরেছি, যদি বেশি বৃষ্টি হয় তো বাড়ির থেকে বেরোব না। এইভাবে কথোপকথন এগোতে থাকে। বাম পাশের শেষ বেঞ্চের একদম কোনায় বসে ছিল গফুর কাকা। বন্যা শব্দটা শুনেই যেন তার শরীর জুড়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই বন্যা নামক অভিশাপটা তাকে আবার গ্রাস করতে চলেছে। তার চোখে ভেসে উঠছে সাত বছর আগের সেই দুর্যোগের রাত, সেই দুর্যোগের বছর। চোখের সামনে দেখেছিল তার মতো গরীবের সুখের সংসারটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে।

গফুর কাকার বাড়ি গ্রামের একদম শেষে, নদীর ধারে। তেরো বছর আগে বিয়ে করে সুখেই সংসার করছিল সে। যমজ দুই মেয়ে এবং তারপর একটা ছেলে। চাষবাস করে বেশ সুখেই দিন কাটছিল তার। কিন্তু বিয়ের ছ'বছর পর এক বর্ষাকাল তার জীবনে কাল হয়ে এলো। সেইবার বঙ্গোপসাগরীয় মৌসুমী বায়ু অনেক আগেই বাংলায় প্রবেশ করেছিল। তাই বৃষ্টির প্রকোপ শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ক্রমাগত বৃষ্টিতে নদী যেন ফুঁসছে, বাড়ছে জলোচ্ছাস, দেখে মনে হচ্ছে যেন শান্ত নদীটি উত্তাল হয়ে উঠেছে, অবিরত নৃত্য করে চলেছে, অট্টহাস্য হাসছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই চাষের জমিতে ঢুকল জল। সারাবছর অসহায় চাষিদের পেটে অন্ন জোগাবার এই চাষের জমি নিমেষের মধ্যে এক চঞ্চল নদীতে পরিণত হল। গফুর কাকাও তাদের মধ্যেই একজন। সারাটা বছর কি করে চলবে এই চিন্তায় সে দিশেহারা। ঘরে তার বউ, দুই মেয়ে ও এক ছেলে। প্রকট খাদ্য সংকট আসন্ন। টানা কয়েকদিন বৃষ্টি হবার পর পবনদেব শান্ত হলেন। পরের দিন রোদ উঠল। চাষের জমিটা দেখতে গিয়ে তার চোখ দুটো জলে ভরে এল। মাথায় হাত দিয়ে অঝোড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ পর নিজেকে শান্ত করল সে। মনে মনে ভাবল, সে বাড়ির কর্তা, সে যদি ভেঙে পড়ে তাহলে তার পরিবারের কি হবে। চোখের জল মুছে মনে জোর এনে বাড়ি ঢুকল সে। পরিবারের সাথে দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে উঠতে না উঠতেই আবার আকাশের মুখ ভার। পশ্চিমের আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই শুরু হল চরম বৃষ্টি, যেন গোটা আকাশ ভেঙে পড়ছে। ইতিমধ্যেই পাশের নদীটি গর্জন করতে শুরু করল। বিকেল অবধি এভাবেই কাটলো। সন্ধে হয় হয়, এমন সময় হঠাৎ তার উত্তরের দিকের মাটির দেওয়ালটা একটা বিকট শব্দে কেঁপে উঠল। চমকে উঠল সকলেই। বিপদ সম্মুখে। ভয়ে, আশঙ্কায় কোন কথা বলতে পারছে না কেউ। ছোট্ট ছেলেটা খাটের এক কোণে বসে। বারান্দায় হতবাক হয়ে দাড়িয়ে গফুর। গফুরের বউ ও দুই মেয়ে ঘরের মধ্যে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। হঠাৎ টিনের চাল থেকে একটা বাঁশ আলগা হয়ে ঝড়ের গতিতে পড়ল ছোট ছেলেটার গায়ে। সাদা চাদর পাতা চৌকিটা নিমেষের মধ্যে লাল হয়ে গেল। অন্ধকারে বোঝা না গেলেও একটু কাছে যেতেই আঁতকে উঠল গফুরের বউ। চেঁচিয়ে উঠল আল্লাহ্ বলে। নিমেষের মধ্যে চোখের সামনে দেখল একটা ফুটফুটে ছেলেকে শেষ হয়ে যেতে। তৎক্ষণাৎ গফুর ঘরে এসে ছেলের মাথার উপর চাপা পড়ে থাকা বাঁশটা সরাতেই নিজের নিষ্পাপ ঘুমন্ত শিশুর রক্তাক্ত মুখটি দেখতে পেল। বুঝতে বাকি রইল না তার ছেলে, তার কোলে পিঠে করে বড়ো করে তোলা ছেলে, তাকে বাবা-বাবা বলে ডাকা তার নিজের ছেলে আর নেই। পাশে দাড়িয়ে থাকা ছোট মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল গফুর। আর এক মেয়ে ও বউও বাঁচাও বাঁচাও বলে জোড়ে চিৎকার করছে। কিন্তু কারোর দেখা নেই। মনে হচ্ছে যেন এই মৃত পৃথিবীতে শুধু তারা চারজন-ই জীবিত। ধরিত্রীর এই নিষ্ঠুর খেলায় তাদেরকেও হারতে হবে। মূহুর্তের মধ্যে এক বিরাট জলরাশি ঢেকে ফেলল তাদের সকলকে। বুকের মধ্যে এক মেয়েকে সে ধরে রেখেছিল। কিন্তু বউ এবং আরেক মেয়ে নিমেষের মধ্যে জলের স্রোতে ভেসে কোথায় চলে গেল তা সে অনুধাবন করতে পারল না। গভীর অন্ধকারে যেদিকেই তাকাচ্ছে শুধু জল আর জল। হঠাৎ ভাসতে ভাসতে সে এক গাছের ডালে আটকাল। গাছ বেয়ে কিছুটা উপরে উঠে মেয়েকে গাছের এক ডালে বসিয়ে সে দিক্‌বিদিক শূন্য হয়ে বউ মেয়েকে খুঁজতে আবার জলে নামলো। কিন্তু জলের স্রোত তখনও সমানভাবে চলমান। বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে পেরে নিরুপায় গফুর আবার গাছে উঠে এল এবং মেয়েটাকে কীভাবে বাঁচাবে সে চিন্তা করতে লাগল। অবশেষে রাত কাটবার আগেই বৃষ্টি থামল। গফুরের বুকের মধ্যে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল মেয়েটা। ভোরের আলোয় ছোট্ট মেয়েটার ঘুম ভাঙতেই মেয়েটি পাশে ভাই, দিদি মা-কে দেখতে না পেয়ে হতবাক হয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল 'মা কোথায়'? যেন আকাশ ভেঙে পড়ল গফুরের মাথায়। সত্যিই তো, এইতো গতকাল তার বউ ছেলে মেয়ে সব ছিল। আজ তারা কোথায়। মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে খুব জোড়ে কেঁদে উঠল গফুর। এই প্রকৃতির নিষ্ঠুর লীলার কাছে তাকে পরাজয় বরণ করতে হল, কাউকেই সে বাঁচাতে পারল না। পরের দিন স্রোতে সাঁতার কাটতে কাটতে সে স্থলভূমি দেখতে পেয়ে এক বাড়িতে আশ্রয় নিল। সে যাত্রায় বাবা ও মেয়ে প্রাণে বাঁচলেও হেরে গিয়েছিল এক চাষির সাজানো জীবন, হেরে গিয়েছিল দারিদ্রতা।

এই অপরূপ পৃথিবীর আকস্মিক উন্মত্ততা বন্যা রূপে এসে হারিয়ে দিয়েছিলো গফুরকে। শুধু গফুর নয় প্রতিবছর ঠিক এই ভাবেই বাংলার শতশত অসহায় নিষ্পাপ মানুষদের হারিয়ে দিয়ে যায় বন্যা। তবে পরিবারের শোক কাটিয়ে আবারও ছোট মেয়েকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখে গফুর। মেয়েটাকে স্কুলে ভর্তি করেছে। জীবনযুদ্ধে আজও অবিরত লড়াই করে চলেছে সে।

কিন্তু আবার এই বন্যার কথা শুনলেই তার বুকটা কেঁপে ওঠে, অসহায় মনে হয় নিজেকে। অতীতটা ভুলবার চেষ্টা করেও ভুলতে পারেনা সে। তাই সেদিন বন্যার প্রসঙ্গ উঠতেই কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল সে। পুরো কথোপকথন শুনলেও একটা শব্দও তার মুখ থেকে বেরোল না। শুধু যাবার সময় পাশে রাখা গামছাটা কাঁধে নিয়ে "আসি গো কর্তাবাবুরা" বলে সে মাথাটা নীচু করে কিছু একটা ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথে রওনা দিল।

‘চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউসমেন্ট’ একটি অবহেলিত অপরাধ

শালিনী মাজি
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

যৌন নির্যাতন নিয়ে কথা উঠলেই যেখানে চারপাশে সবাই কানফিসফিস করে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই “শিশু যৌন নির্যাতন” বা “চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউসমেন্ট” শব্দবন্ধটির সাথে অনেকে পরিচিতিই নন। কিন্তু দুভার্গ্যবসত পরিসংখ্যান বলছে গড়ে প্রতি ৩ জনে ২ জন শিশু, যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধী খুব পরিচিত কেই। পাড়ার কাকু/কাকিমা, মাসতুতো দাদা/দিদি, ইস্কুলের স্যার/ম্যাডাম, পরিবারের খুব বিশ্বস্ত কেউ। তাই কেনো শিশু, দিনের পর দিন (বহুক্ষেত্রে বছরের পর বছর) নির্যাতিত হওয়ার পরেও কাউকে বলে উঠতে পারে না তার সাথে ঘটে চলা অন্যায়ের কথা। এছাড়া ছোটোবেলা থেকে সঠিক যৌনশিক্ষার অভাবে অনেক সময় শিশুরা বুঝতেই পারেনা তাদের সাথে যা হচ্ছে তা অন্যায়। ফলে শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। এমনকি ছোটবেলার ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনার প্রভাবে কেউ সারাজীবনের মত মানসিক অবসাদের শিকার হতে পারেন। মাথায় রাখা দরকার ছেলে, মেয়ে উভয়েই প্রায় সমান অনুপাতে শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে (ছেলেরা অনুপাতে খানিক বেশি) এবং অপরাধীও যেকোনো লিঙ্গের হতে পারে।

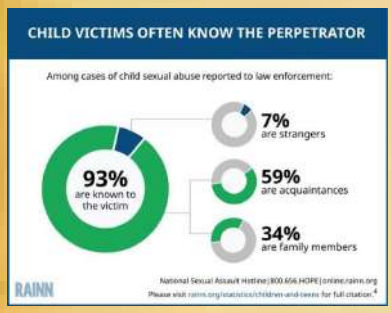

বর্তমানে এই শিশু এই অপরাধের শিকার হলে, অপরাধীকে পকসো (Protection of Children from Sexual Offence) অ্যাক্টে সাজা দেওয়া হয় যা সম্প্রতি ২০১২ সালে প্রণোদিত। কিন্তু তার আগে? শুনলে অবাক হবেন এই ভীষণ ভয়ানক অপরাধের বিরুদ্ধে ২০১২ সালের আগে ভারতীয় দন্ডবিধিতে কোনো নির্দিষ্ট আইন ছিল না। অপরাধীকে তবে সাজা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হত? তিনটি আইনের ভিত্তিতে। এক, IPC ৩৭৫-যা মূলত ধর্ষণ বিরোধী আইন, দুই, IPC ৩৫৪-যা মহিলাদের সম্মানহানি বিরোধী আইন এবং তিন IPC-৩৭৭, যা “আনন্যাচারাল অফেন্স” বিরোধী আইন। ২০১৯-এর সমীক্ষা বলছে প্রতিদিন গড়ে ১০৯ জন শিশু যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছে যার মধ্যে প্রায় ৫৩% ছেলে। অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় ধারা দুটি কোনো ছেলে ভিক্টিম-এর জন্য প্রয়োগ করা সম্ভবই নয়। তাই বলা বাহুল্য অপরাধী খুব সহজেইপার পেয়ে যেত। অবশেষে এই আইনে বদল আসে ২০১২ সালের ২২ শে মে। ২০১২ সালের ১৩ ই মে, একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সম্প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানে প্রথমবার চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউসমেন্ট নিয়ে জনসমক্ষে আলোচনা হয়। গোটা দেশে আলোড়ন পড়ে যায়। চাইল্ড হেল্প লাইন নম্বর ১০৯৮ এ হুড়হুর করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহায্য চেয়ে ফোন আসে এবং তারপরেই ২২ মে পসকো আইন পাশ হয় লোকসভায়। পকসো আইনে কি আছে তা বিস্তারিত লিখলাম না(বিস্তারিত পড়ার জন্য নীচে তথ্যসূত্র দেওয়া হল।)

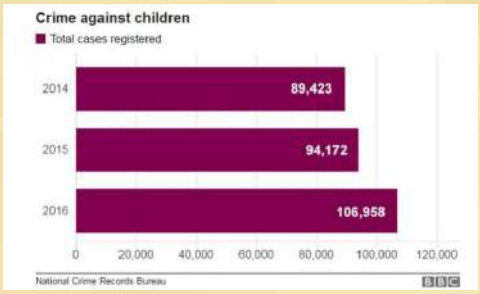

এই আইন এই ধরনের কেসের বহু জটিলতা কাটিয়ে দিলেও বেশকিছু নতুন জটিলতার সৃষ্টিও করেছে। উদাহরণ হিসাবে সম্প্রতি ২০১৬ সালে ঘটে যাওয়া একটি শিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনাকে ধরে নেওয়া যাক, সেখানে অপরাধী, ১২ বছরের একটি মেয়েকে পেয়ারা কিনে দেওয়ার অছিলায় আটক করে। আপত্তিকর বিভিন্ন যৌন ইঙ্গিত করা ছাড়াও মেয়েটির পরনে থাকা চুরিদারের ওপর দিয়েই বলপূর্বক স্তনমর্দন করে। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে যৌন নির্যাতনের হলেও বোম্বে নাগপুরের হাইকোর্টের বিচারপতি, অপরাধীকে পকসো আইনে নির্দোষ ঘোষণা করে। পকসো আইনের ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যৌনউদ্দেশ্য নিয়ে, কোনো শিশুর যৌনাঙ্গ, বক্ষস্থল স্পর্শ করলেই আইনের চোখে সে অপরাধী কিন্তু সেক্ষেত্রে “skin to skin touch” আবশ্যক। উক্ত ঘটনায় অপরাধী কেবলমাত্র চুরিদারের ওপর দিয়ে বক্ষস্থল স্পর্শ করায়, পরোক্ষভাবে কোনো “skin to skin touch” না হওয়ায়, অপরাধীর এইধারায় সাজা হয়না। সুতরাং এ বিষয়টি স্পষ্ট যে নতুন তৈরি হওয়া পকসো আইন নিয়েও ইতিমধ্যে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন পড়েছে। (২০২০ সালে অপরাধীর অপহরণের ৩৫৪, ৩৬৩ ধারা ও বেআইনীভাবে আটক করে রাখার ৩৪২ ধারা অনুযায়ী শাস্তি হয়)

এই ধরনের অপরাধ নির্মূল করার একমাত্র উপায় হল ইস্কুলস্তর থেকে সঠিক যৌনশিক্ষা প্রদান করা। সরকারী উদ্যোগে সঠিক সিলেবাসে তৈরি করে, প্রত্যেক স্কুলে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা। ছোট থেকেই শিশুদের বাড়িতে এবং ইস্কুলে "গুড টাচ-ব্যাড টাচ" এর ধারণা দেওয়া। সহজ পদ্ধতিতে যৌন অপরাধের সম্পর্কে সচেতন করা। সিলেবাসে যৌনশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। ইতিমধ্যে চাইল্ডলাইন, রাহীর মত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা/ ব্যাক্তিগত উদ্যোগে শহর ও শহরতলির কিছু স্কুলে সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করলেও, তার সংখ্যা হাতে গোনা। সেক্ষেত্রে সরকারের সামনে এই গুরুতর সমস্যাকে বারবার তুলে ধরতে হবে।

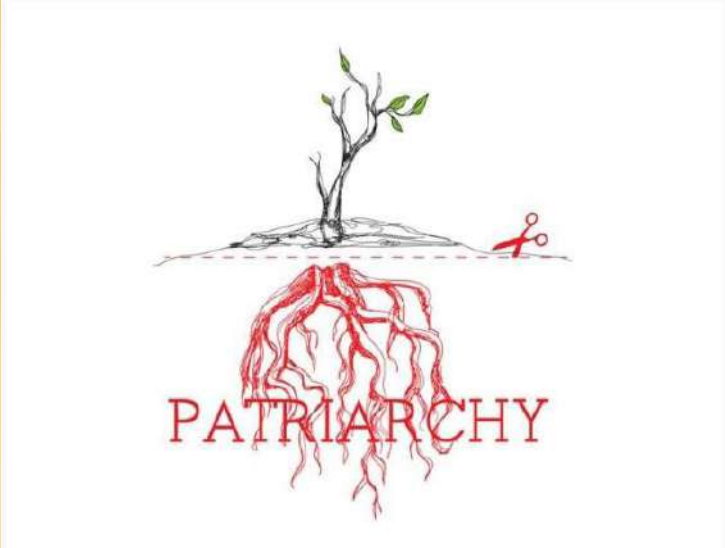

শিক্ষকমহল, অভিভাবকমহল থেকে সম্মিলিতভাবে, সিলেবাসে যৌনশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবি জানাতে হবে এবং অবশ্যই অভিভাবকদের ছোটদের কাছে সেই ভরসা জায়গা গয়ে উঠতে হবে, যেখানে নির্দ্বিধায় মনের সব কথা খুলে বলা যায়। যেকোনো ধরনের যৌন অপরাধে মূলে থাকে পিতৃতন্ত্র। তাই পিতৃতন্ত্রের বিনাশ, যৌন অপরাধ দমনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কোনো শিশুকে যেন আগামীতে এ ধরণের শিকার হতে না হয়, এই আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে দায়বদ্ধতা।

পুনশ্চঃ বর্তমানে কোনো শিশু, যৌন নির্যাতনের শিকার হলে চাইল্ডলাইন নামক বেসরকারি সংস্থার হেল্পলাইন নম্বর ১০৯৮-এ ফোন করলে তৎক্ষনাৎ সাহায্য মিলবে। এছাড়া রেন, রাহীর মত বেসরকারী সংস্থাগুলির হেল্পলাইন নম্বর ২৪ ঘন্টাই নির্যাতিত শিশুদের সাহায্য করার জন্য খোলা থাকে।

যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া এক শিশুর আঁকা

১. বাহায় তুলুয়ান NGO-এর "Stop the Silence" ভিডিওর সমস্ত আঁকা। (প্রত্যেকটি আঁকা কোনো না কোনো নির্যাতিত শিশুর আঁকা) ঃ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://assets.rappler.com/612F469A6EA84F6BAE882D2B94A4B421/img/9D9AEC0B5A934E08B9E4FAAEBB3C4839/bahay-tuluyan-video-05042018.jpg&imgrefurl=https://www.rappler.com/moveph/bahay-tuluyan-stop-the-silence-video-against-child-abuse&h=448&w=800&tbnid=Fy8MJ5O_RFXM4M&tbnh=168&tbnw=300&osm=1&hcb=1&source=lens-native&usg=AI4_-kTVjjVCp7j7aXYjBGeZ3whrJLdkIQ&docid=WWoGsv3ow2hhWM&ved=0ahcKEwiA-5T03fLzAhUAAAAAHQAAAAAQURCZ2gcIBQ#imgrc=Fy8MJ5O_RFXM4M&imgdii=JxGZ7ih960h8yM

২. পকসো আইন নিয়ে বিশদে পড়তেঃ "**India Code: Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012**" :
https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2079?sam_handle=123456789/1362

৩. শিশু যৌন নির্যাতন নিয়ে ভারতবর্ষে কাজ করা দুটি বেসরকারি সংস্থার ওয়েবসাইটঃ

"**RAHI Foundation**": https://www.rahifoundation.org

"**Child Sexual Abuse | CHILDLINE 1098 | CHILDLINE India Foundation**": https://www.childlineindia.org/a/issues/sexual-abuse

তথ্যসূত্র ও চিত্রসূত্র ঃ

১. বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন
২. উইকিপিডিয়া
৩. গুগল
৪. চাইল্ড লাইন, রাহী, রেন সংস্থার ওয়েবসাইট
৫. রাহী সংস্থা আয়োজিত সেমিনার

The Summer Capital of British India- Shimla

Disha Banerjee
(2nd year, 2020-2022)

Shimla, once just a small village located over 7000 ft above sea level was a part of the Kingdom of Nepal until the area was ceded to the British Raj as part of the Sugauli Treaty. Soon it became a go-to destination for Britishers as it was believed that the cold weather helps in recovering from long term illnesses and the climate was very similar to that of their native place and hence for them it became a home away from home. In the year 1864, the viceroy of India, Sir John Lawrence officially declared Shimla as the summer capital of British India, the title it held for 75 years up to 1939. The popularity of Shimla increased when the Kalka - Shimla railway line opened up in 1903 as it made the place more accessible to the people. This railway route is still popular to this day for its mesmerising views of the surrounding hills and villages. On 8th July 2008, UNESCO added Kalka - Shimla railway to the mountain railways of the India World Heritage site. Shimla was the capital of the undivided state of Punjab in 1871 and remained so even post-independence until the formation of the state of Himachal Pradesh in 1971, Shimla was named its

Shimla city

capital. Since 2017, Shimla serves as the summer capital of Himachal Pradesh whereas Dharamshamla serves as its winter capital.

The city was named after Shyama Mata, an incarnation of goddess Kali. In 2018, the state government of Himachal Pradesh proposed to change the name to Shyamala but it received backlash from locals and so the plan was called off. Initially, Shimla was built on top of seven hills: Inverarm Hill, Observatory Hill, Prospect Hill, Summer Hill, Bantony Hill, Elysium Hill and Jakhu Hill. Now the city has expanded far beyond these hills. One of the most popular sightseeing places is the Jakhu Temple is an ancient temple in Shimla, dedicated to the Hindu deity Lord Hanuman. It is situated on Jakhu Hill, Shimla's highest peak. According to the Ramayana, Hanuman stopped at the location to rest while searching for the Sanjivni Booti to revive Lakshmana. A giant 108-feet-high idol of Hanuman was unveiled at Jakhu Hanuman temple on 4 November 2010 which surpasses even the world-famous statue of Christ the Redeemer in Rio de Janeiro, Brazil. Just like most of the places

Hanuman Idol at Jakhu Temple

in Shimla, the surroundings of the Jakhoo Temple are complemented by amazing views that make the setting even more spectacular. It is a great place to enjoy the awe-inspiring sunrises and sunsets and an adventurous drive for trek enthusiasts. Other than that, the lush green winding pathways are an absolute treat for nature lovers. It is very close to Lakkar Bazaar, a market extending off the Ridge, sells souvenirs and crafts made of wood and a widely known as the popular shopping street of Shimla among tourists. The items sold here range from excellent pieces of jewellery, embroidered shawls and garments to leather made articles and sculptures.

Another popular sightseeing place in Shimla is the christ church which is very close to mall road. It is

the second oldest church in North India, after St John's Church in Meerut. It is designed in the neo-Gothic style. One can experience the breathtaking view of Shimla night lights from here. Another noteworthy place is the Viceregal Lodge, now known as the Rashtrapati Niwas. It was formerly the residence of the British Viceroy of India. It was designed by British architect Henry Irwin and built in the Jacobethan style during Lord Dufferin's tenure as Viceroy. Post-independence it was the summer home for the President of India but the Presidents hardly came to visit there. This place was handed over to the Ministry of Education by Professor S. Radhakrishnan thought of putting it to academic use. It now serves as the Indian Institute of Advanced Study and is now home to many scholars and students who live on this beautiful

Shimla Mall Road and Christ Church

Viceregal Lodge

campus in their pursuit of knowledge. It is open to tourists who can relax in the garden and enjoy the lush green campus along with the nearby museum.

Kufri, also known as a trekker's paradise is a place just 20 km far from Shimla. The name Kufri is derived from the word 'Kufr' which translates to 'Lake' in the local language. Mahasu peak is considered as one of the highest points of Kufri offers breathtaking views of the holy Kedarnath and Badrinath ranges. The view of a snow-capped mountain is definitely bound to mesmerize you. The Great Himalayan Nature Park in Kufri, on the other hand, is home to more than 180 species of animals and birds. One of the most unique tourist attractions of Kufri is its yak riding activity, one can also take a yak ride all the way up to the picturesque site of Fagu, situated 6 km away from Kufri.

Kufri (source: tripnight.com)

Fagu (source: www.indyabiz.com)

Shimla and the areas in the vicinity boast of its diverse flora and fauna, breathtaking scenery, rich culture, diversity, craftsmanshipand historical significance. There and many relatively untouched places in the vicinity of the city where one can get away for a change of pace from their daily lives filled with hustle and bustle to a relatively secluded place where one can enjoy their own company midst the nature in its most pristine form. These places are a treat to the eyes and can have a calming effect on the soul. During summer when most of the country experiences scorching heat, Shimla offers a comfortable climate that attracts tourists this part of the year. The hills can get particularly dangerous in monsoon though due to repeated landslides and floods. Winter also attracts a fair share of tourists who want to enjoy snowfall and the breathtaking beauty of snow-capped mountains. It is a place definitely worth visiting for nature and adventure lovers.

Kalka-Shimla Railway Line (source: curlytales)

Source:

1. en.wikipedia.org
2. shimlatourism.co.in
3. https://www.tourmyindia.com/states/himachal/kufri.html

সভ্যতার ইতিবৃত্ত

সায়ন্তন বিশ্বাস
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

আমরা পরিবেশের তারতম্যে, জীবজগতের তারতম্য দেখতে পাই। যেমন জলে ও স্থলে জীবের অন্ত-বহির তারতম্য স্পষ্ট। তার বিবর্তন, প্রকৃতির অনুকূলে তাকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ঠিক তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পরিবেশ, স্থানীয় মানব জাতির ওপর একটি বিশেষ অনন্যতা প্রদান করে এবং দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সেই অনন্যতাগুলি সংস্কৃতির আকারে নিজেকে প্রকাশ করে, গড়ে তোলে Civilization বা সভ্যতা।

প্রতিটি স্যভতার ভালো-মন্দ আছে। দুটি সভ্যতা যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, একের ভালো মন্দ অন্যকে প্রভাবিত করে। পৃথিবী অনেক সভ্যতা সৃষ্টি হতে দেখেছে, দেখেছে গুড়িয়ে যেতে। প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে ব্যবীলন, মায়া, ইজীপ্টীয় সভ্যতা মিশে গেছে প্রকৃতির কোলে। তা প্রাকৃতিক নিয়মে, না অন্য সভ্যতার প্রভাবে হয়েছে জানা নেই। প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও চৈনিক সভ্যতা এখনও টিকে আছে।

এই সব সভ্যতার ঠিক পরবর্তী যুগের সভ্যতা, গ্রীস বিলিয়ে গেছে রোমান উত্থানে, ইরানীয় সভ্যতা মিশে গেছে ইসলামের সাথে। সবচেয়ে আধুনিক সভ্যতাগুলির মধ্যে টিকে আছে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা। বর্তমানে মূলত চারটি সভ্যতা টিকে আছে। এখানে বলে রাখা ভালো, কোনো সভ্যতাই তার আপন মৌলিকত্বে আর নেই, পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বা কখনও অন্য সভ্যতার পদদলনীতে পরিবর্তন হয়েছে মৌলিকতার।

চারটি সভ্যতা হল- চীনা, ভারতীয়, পাশ্চাত্য ও ইসলামীয় সভ্যতা। এর মধ্যে সমগ্র বিশ্ব যে ভাবে আজ চালিত তা হল পাশ্চাত্য সভ্যতা।

প্রকৃতি প্রতিটি সভ্যতাকে এক এক সময় সুযোগ দেয় জগতের উন্নতির ও কল্যাণের। ভারতীয় বৈদিক সভ্যতা একসময় শ্রেষ্ঠ স্থানে ছিল। আজ আমাদের কারণে তা সীমিত ভাবে বেচে আছে। স্বামীজী বলেছেন ভারতের অবনতির মূল কারণ- mass জনসাধারণকে উপেক্ষা করা। এর পর বৌদ্ধিক যুগেও ছিল ভারতের স্বর্ণযুগ কিন্তু তারপর সেই অবনতির ইতিহাস। কিন্তু এত ধাক্কা সত্ত্বেও যে, এ সংস্কৃতি টিকে আছে, স্বামীজী বলেছেন এর পৃথিবীকে দেওয়ার মতো এখনও কিছু আছে।

ইসলামে কথা যদি বলি প্রকৃতি তাকেও সুযোগ দিয়েছিল কিন্তু আজ স্বসার্থে ইসলাম রাষ্ট্র বিভক্ত ও এত জনসংখ্যা সত্ত্বেও Political power তার নেই বললেই চলে।

ইসলামের পর প্রকৃতি সুযোগ দিয়েছে পাশ্চাত্যকে, এখনও জগতের কল্যাণের সুযোগ আছে তার, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে সকলকে দাবিয়ে রাখতে চায় আপনার পদতলে। এ সভ্যতা যদি না সুধরায়, তবে এর পরে প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্ব চালিত হতে পারে চীনের দ্বারা এবং আবার রক্তাক্ত যুগের সাক্ষী হতে হবে পৃথিবী।

আমাদের যা কিছু খামতি, সুধরে নেওয়াও সুযোগ হয়ত আবার পাবো, যারা সুধরে নেবে বেচে যাবে, যারা পারবে না হয়তো মিশে যাবে প্রকৃতির কোলে। এভাবে কত খেলারই না সাক্ষী থেকেছে পৃথিবী।

আমাদের দেশের দূর্বলতা হল আমাদের কোন জাতীয় আদর্শ নেই। চীনের তা আছে, তা হল নিজেদের বিশ্বের কাছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা, পাশ্চাত্যেরও আছে জাগতিক সুখ যত পরিমাণে সম্ভব ভোগ করা। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের কিছুই যেন নেই, পাশ্চাত্যের প্রভাবে আমরা যদিও তাদের ভাব গ্রহণ করেছি কিন্তু তা হজম করতে পারছিনা।

চীনের উত্থান বোধ হয় কেউ রোধ করতে পারবে না, তবে আমাদের অবশ্যই একতার সঙ্গে ভারতের কল্যাণে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অবদান রাখতে হবে। তবে অবশ্যই আমরা আমাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে অবদান রাখতে পারব বিশ্ব কল্যাণে। আমাদের বিশ্বাস প্রকৃতি ভারতকে আবার সুযোগ দেবে। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে- এই আশা, এই স্বপ্ন পূরণ হোক পূরণ হোক পূরণ হোক হে ভগবান।

স্বপ্নপূরণ

দেবাদৃতা রায়
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২০-২২)

সপ্তকোটি সন্তানেরে
হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী করে
মানুষ করোনি।

সত্যিই বাঙালী কবে যে মানুষ হবে? বহুবছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতে ধরা পড়েছিল এই হতাশা, মনে জেগেছিল ভাবনা।
স্বামী বিবেকানন্দের কুমারী পুজোর উদ্দেশ্য স্বার্থকতা পেয়েছে কি?

নাঃ আমরা তা হতে দিইনি, আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলাদের **শিক্ষার আলোতে** উন্মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার জন্য অভিভাবকরা যেমন দায়ী তেমন দায়ী সমাজ। অশিক্ষার অন্ধকারে তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। কি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা!

একটা বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে প্রস্ফুটিত ফুল গাছে কুঁড়ি এলে গাছে উপযুক্ত সার দেওয়া প্রয়োজন, আর মানব জীবনে সার হল শিক্ষা।

কিন্তু আমরা যদি গাছে সার না দিয়ে কুঁড়ি অবস্থাতেই তাকে তুলে ফেলি, তাহলে এই কুঁড়ি পাঁপড়ি মেলে ফুটে ওঠে তার সৌন্দর্য ও সুবাস বিলিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাবে কি করে?

দিকে দিকে স্লোগান– সমাজে নারী শিক্ষার উন্নতি, নারীর সম্মান রক্ষা নিয়ে কিন্তু আমরা কি তা সম্পূর্ণ ভাবে করতে পেরেছি?

বিষবৃক্ষ কে চারাগাছে উপড়ে না ফেলে জল দিয়ে তাকে বড়ো করে তুলেছি, ভবিষ্যতে আরো অপরাধ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছি। লোকলজ্জার ভয়ে প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে তাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে গেছি, পাছে লোকে কিছু বলে সেই ভয়ে। আচ্ছা বলুন তো এর জন্য কে বা কারা দায়ী?

নিঃসন্দেহে আমরা। কারণ অত্যাচারীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা ভুলে যাই, আমাদের ঘরের মেয়ে, ঘরের লক্ষ্মী। তাদের মুক্ত স্বাধীনতা দিয়ে স্বনির্ভর করে তুলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে **জগতের আনন্দযজ্ঞে** সামিল হওয়ার যোগ্য করে তুলতে হবে। **শিক্ষার আলোয়** তাকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আলোকিত করতে হবে। **"আলোক এর এই ঝর্ণাধারায়"** ধুয়ে যাক সব বিধিনিষেধ, সংকীর্ণতা।

কন্যাসন্তানের জন্ম হওয়ার সাথে সাথে বাবা মায়ের চিন্তা তার বিয়ে দেওয়া নিয়ে। কেন? কন্যাসন্তান কি পারে না, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বনামধন্য পিতার মুখ উজ্জ্বল করতে?

নারীজাতি কি কেবল সেবিকা? তার নিজস্ব স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকতে নেই? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন নারী শিক্ষার প্রসার, কিন্তু সেভাবে তা হয়নি। সত্যি, আমরা তবুও এতে পিছিয়ে কেন?

ধূপ চিরদিন নীরবে জ্বলে যায়
প্রতিদান সে কি পায়?

এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

"সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে" - পুরুষদের গুণে নয় কেন? তার উত্তর দেবে সমাজ। একজন সাধারণ রমণীর ভূমিকা প্রথমে পিতার গৃহে বাধ্য কন্যা স্বামীর গৃহে পতিব্রতা স্ত্রী। তারপর স্নেহময়ী জননী তারপর লাঞ্ছিতা মাতা।

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে , তাহাদের সবার সমান"

তা আর হচ্ছে কোথায়! ১০-১২ বছরের কন্যা বাল্যকালেই গৃহস্থী। ছোট্ট গৃহবধূ চার দেওয়ালের আস্তানা– জানলা দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে নীল আকাশের দিকে- ইচ্ছে করে ডানা থাকলে পাখি হয়ে চাঁদের দেশে উড়ে যেত। সেই নাবালিকা গৃহবধূ জানেনা, ডানা ছাড়া চাঁদের দেশে যাওয়া সম্ভব, উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে। জানবে কি করে? সে সুযোগ তো তাকে দেওয়া হয়নি। চার দেওয়ালের মাঝে, অশিক্ষার অন্ধকারে বন্দি নারীর বিহ্বল কালো চোখের তারায় টলমল করে জলধারা। সকলের অজান্তে দু-ফোঁটা জল মুক্তোর মত গড়িয়ে পড়ল মসৃণ গাল বেয়ে। সে দৃশ্য সমাজের চোখে পড়েনা। সমাজ জানেনা তার মূল্য কতখানি। চার দেওয়ালের অন্ধকারে বন্দিনী গৃহবধূর স্বপ্ন মরে যায়।

এতে কার দোষ জানিনা, ইচ্ছে করলে কিছুই করতে পারি আমরা। যদি হাতে হাত মিলিয়ে তাদের স্বপ্নকে পূরণ করার মহান ব্রতে এগিয়ে আসি, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে উচ্চস্বরে বলতে পারি–

বঙ্গ ললনা তোমরা জাগো, তোমরা পারবে সমাজের বুকে নারী স্বাধীনতা কে প্রতিষ্ঠিত করতে।

বর্জ্র কণ্ঠে ঘোষণা করো–

"ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার।"

সমগ্র নারী জাতিকে এগিয়ে আসতে হবে তবে হবে স্বপ্নপূরণ।

"প্রভাত সূর্য তোমার আলোয়
আনো নতুনের সূচনা
স্নিগ্ধ লালিমা ছড়ায়ে
ঘুচায়ো রাতের কালিমা।
পুরুষের পায়ে নিবেদিত কেন
নারীজাতির প্রাণ
ঈশ্বর তুমি পথ বলে দাও
বাঁচাও তাদের মান"

জানিনা কবে আসবে সেই সুদিন। শ্রাবণের ধারার মতো ঝড়ে পড়বে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বাংলার নারী সমাজের ওপর। বিশ্বের দরবারে উপেক্ষিত না হয়ে সে হবে বরেণ্য, প্রতিবাদের সুর ঝড়ে পড়বে তার কণ্ঠে।

ছবি: সন্মিত্র

Football in La Catedral

Sreyan Bhowmick
(2nd year, 2020-2022)

Football is hailed as the greatest form of extravaganza in the lives of people throughout the world. Beautified by the likes of Pele to Maradona, Cruyff to Beckenbauer, Lionel Messi to Cristiano Ronaldo; football has come a long way withering the test of time. Played in over 200 countries around the globe, football has been inherently intertwined with the lives of the common man. This sport is blessed by magnificent stadiums, passionate fans and immortal stories that have passed on from generation to generation. Tournaments like the World Cup, UCL, Premier League etc. are devoured by millions of people throughout the world. Strange things have happened associated with this funny, little ball throughout the years and today we shall be looking at such a story that is bound to keep you glued to your seats.

When you hear the name "Football", certainly the first person that doesn't flash into your mind is Pablo Escobar, the notorious Columbian drug lord dubbed as the "King of Cocaine". His infamous drug cartel made him the wealthiest criminal in history, who had essentially a whole continent operating under his powers. Well, apart from loving drugs obviously, this guy had an immense love for football as well. It's a well known secret that he ran Atletico Nacional, his hometown soccer club in Medellin. He gave future Columbian superstars like Rene Higuita, Chicho Serna etc. a shot at their careers.

In 1991, Escobar surrendered to authorities and struck a deal with Colombian President Cesar Gaviria: no extradition to the U.S. in return for five years in Colombian prison—a prison he designed and staffed himself named 'La Catedral'. At the heart of La Catedral was a hard-court football pitch with a small five-a-side goal. Escobar frequently staged games involving pretty much the entire Colombian squad,and they were paid generously for attending.

In 1991, Diego Maradona visited La Catedral after he received a 15-month ban for failing a drug test at Napoli. Pablo was a longtime fan of the Argentine legend. Escobar offered Maradona an enormous appearance fee to play alongside Higuita. Maradona claimed he did not know who 'El Patron' was when he met him, but he played in the match, and afterwards, they partied together through the night. Maradona later said:

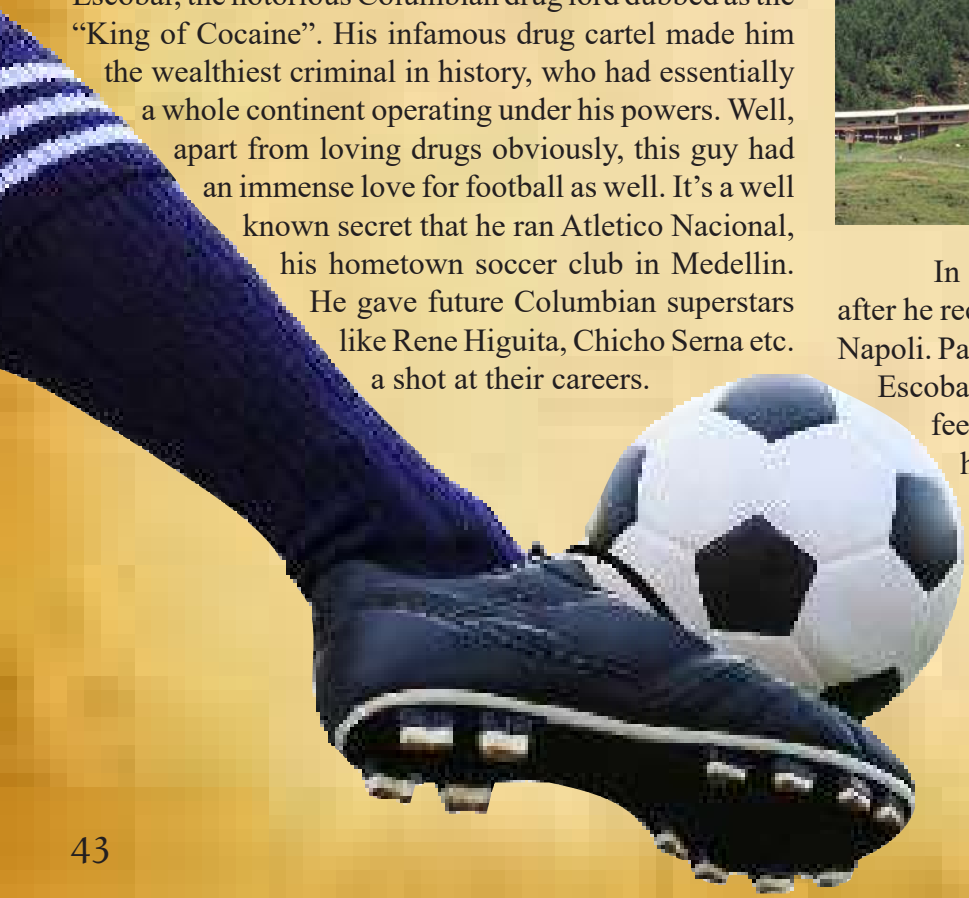

Diego wasn't the only star to be invited inside Pablo Escobar's disneyland. Former Columbian international player and current Orlando City manager Oscar Pareja recalls being invited along with six Independiente teammates to La Catedral, an invitation he could not refuse. Escobar treated him as a god, and after meeting with him, they played a match together. In his words, "There were fine couches in there and TVs... It made me wonder who exactly is the prisoner here today?...I think back now and consider all the things that could've happened to us inside those walls.There were no police. No control. Anything could've happened. But it didn't."

These football matches came to an end after murders were committed in La Catedral. There were rumors that Escobar executed his rivals, which gave the football court a stained red color. In 1992, he escaped and went into hiding when authorities attempted to move him to a more standard holding facility, leading to a nation-wide manhunt. As a result, the Medellín Cartel crumbled, and in 1993, Escobar was finally killed in his hometown by Columbian National Police, a day after his 44th birthday. And this is how the strange love affair between the notorious kingpin and his starstudded football matches at "La Catedral" ended giving it a mythical status in the history of the sport.

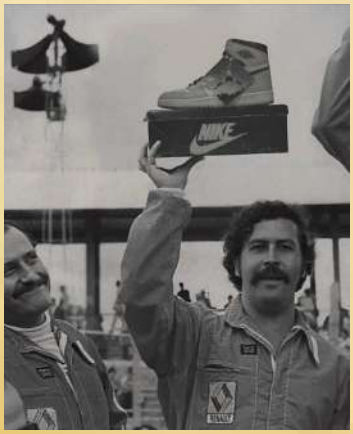

Where beauty lies.

Avipsa Chakrabarti
(1st year, 2021-2023)

Beauty lies deep within knowledge.
Beauty lies in a sacred soul.
Beauty lies where science denies, the presence of a master force.
Beauty lies where woods so green, dance along the serene wind.
Beauty lies where Allah and Christ live in peace between.

But beauty ends when cunningness, wins over knowledged men.
Beauty ends when souls so innocent are controlled by the tactics of mind.
Beauty ends when woods suffocate, breathless in the dusty winds.
What even is that beauty? Standing tall, framed in lies.

Drawings

Our respected teachers

Kamakhya Narayan Dutta

(2nd year, 2019-2021)

> Teachers have 3 loves: love of learning, love of learners and the love of bringing the first two loves together.
>
> *~Scot Hayden*

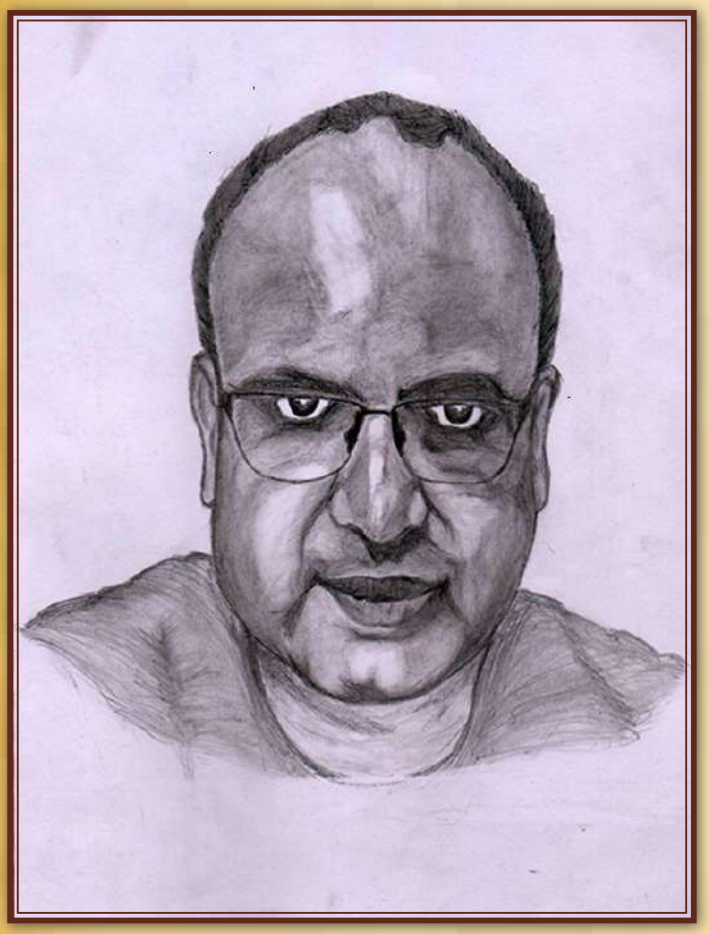

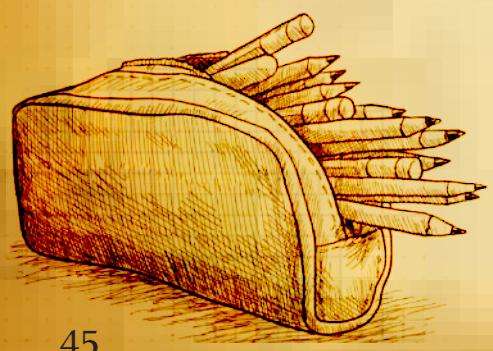

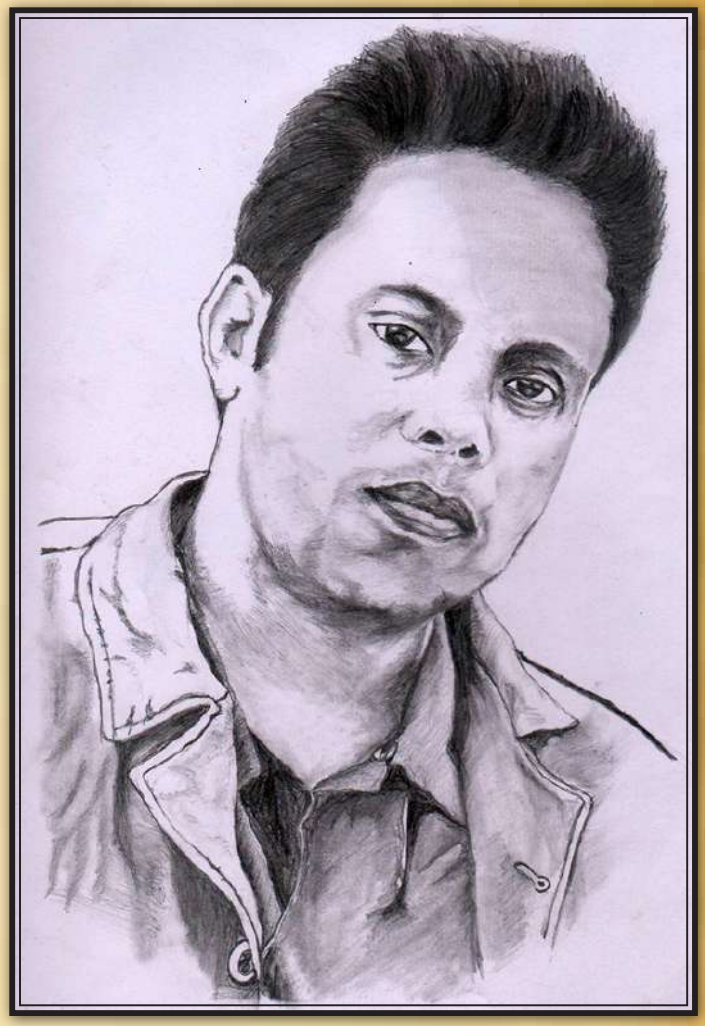

Drawings

Arnab Bhowal
(2nd year, 2020-2022)

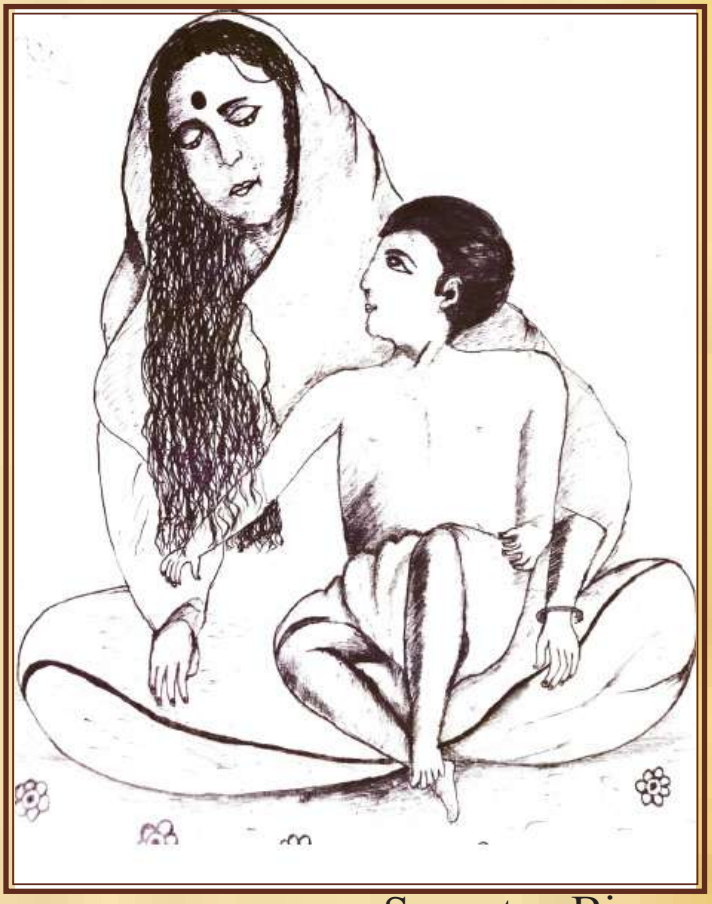

Sayantan Biswas
(2nd year, 2020-2022)

Drawings

Madhusri Roy Chowdhury
(1st year, 2021-2023)

Sreya Chatterjee
(1st year, 2021-2023)

Drawings

Rwik Dhramapal Banerjee
(2nd year, 2020-2022)

নারী

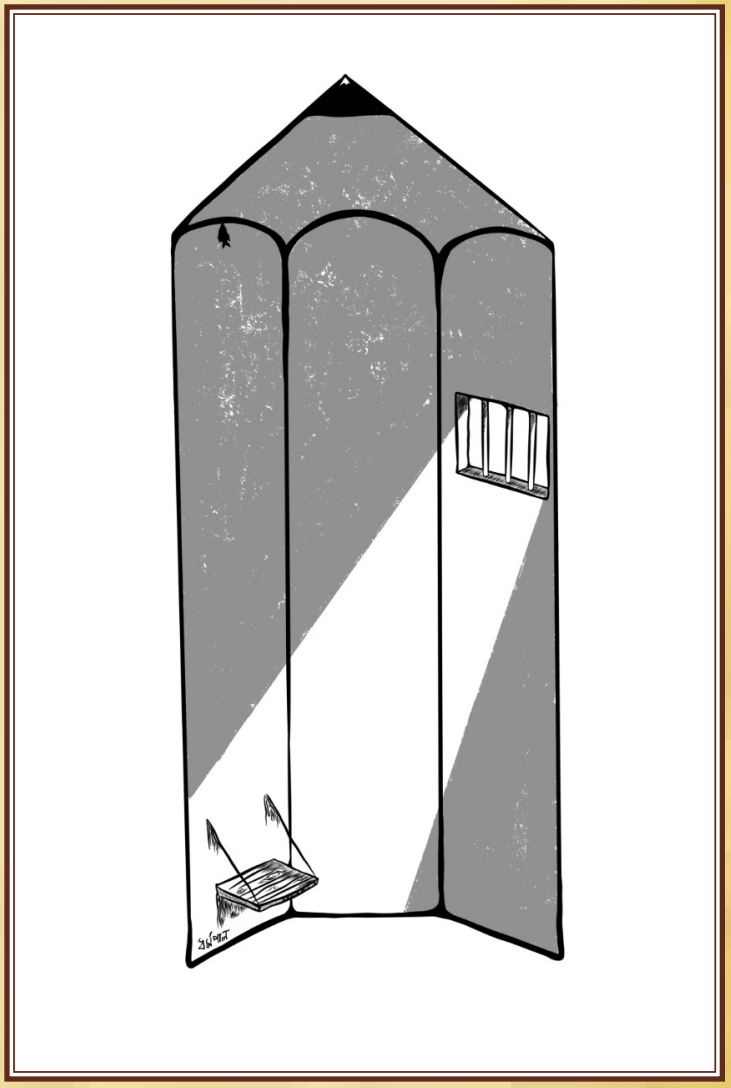

ভাবের গরাদ

Drawings

Disha Banerjee
(2nd year, 2020-2022)

Drawings

Krittika Adhikari
(1st year, 2021-2023)

...You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

The answer, my friend,
is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind...

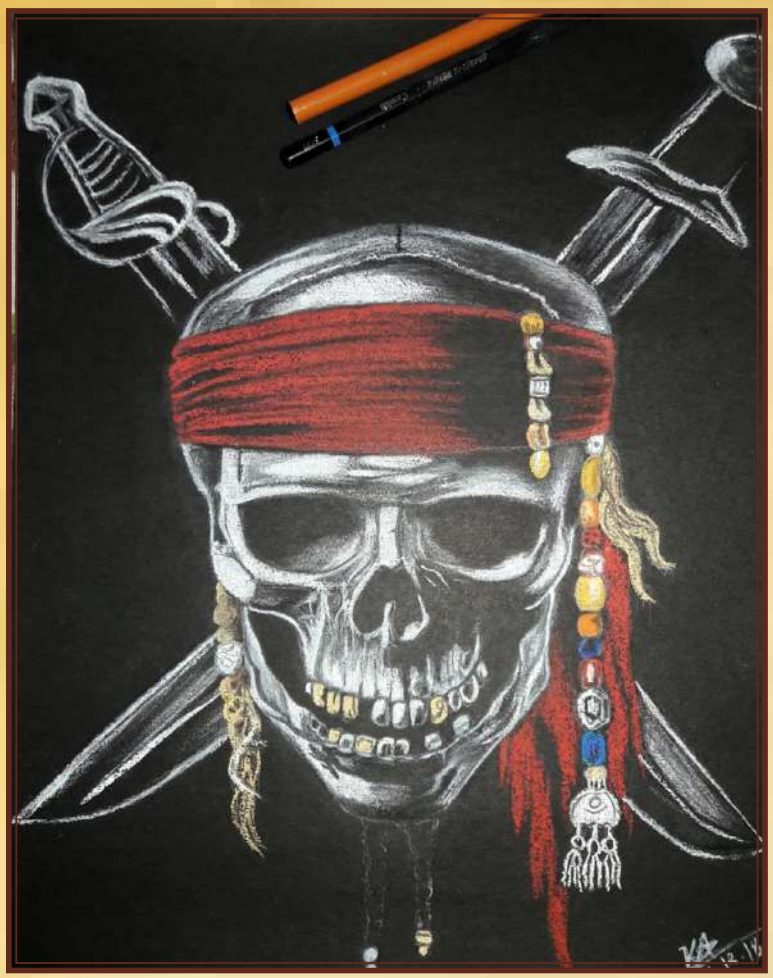

Drawings

Towasum Mondal
(1st year, 2021-2023)

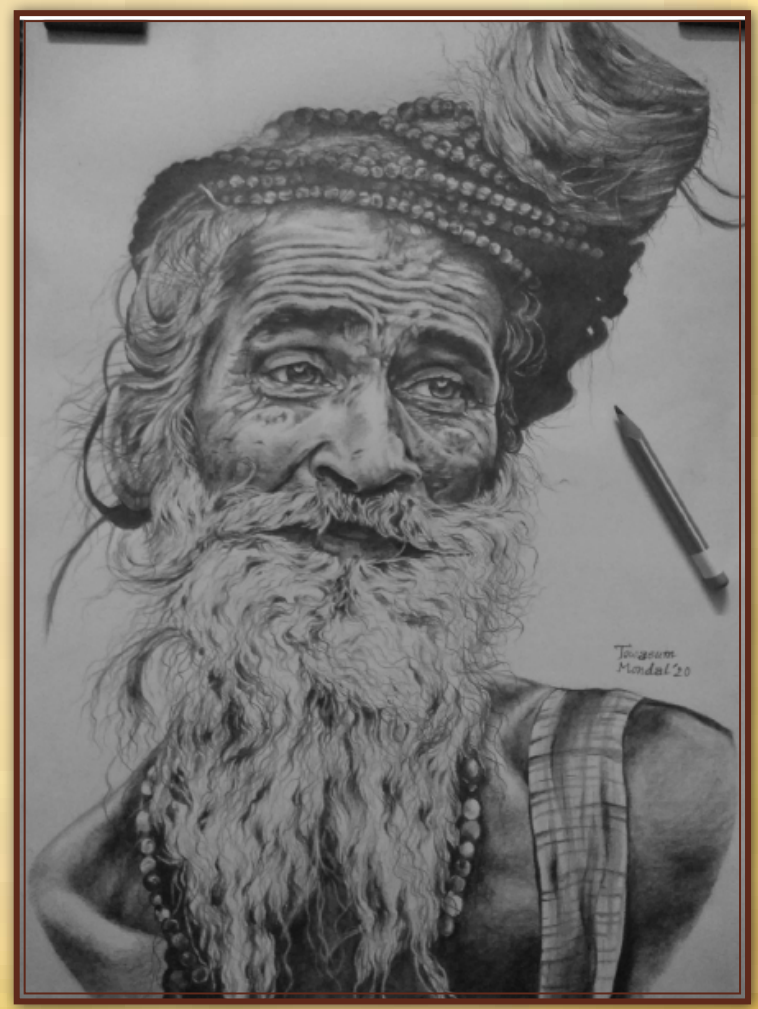

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

Photography

Sayan K. Pal
Visiting Research Fellow,
S.N. Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata

Two Paths towards...

Photography

Krittika Adhikary
(1st year, 2021-2023)

"The sky was incredibly far away, and beautiful enough to make a person wonder why our hearts are never so free.

– Banana Yoshimoto

Photography

Saibal Misra
(2nd year, 2020-2022)

Photography

Subir Manna
(2nd year, 2020-2022)

Photography

Amitava Bhattacharyya
Assistant Professor,
Department of Physics, RKMVERI

Stonehenge
(Salisbury Plain, Wiltshire, England)

Blenheim Palace
(Blenheim Park, Woodstock OX20 1PP, United Kingdom)

University of Cambridge
(The Old Schools, Trinity Ln, Cambridge CB2 1TN, United Kingdom)

University of Cambridge
(The Old Schools, Trinity Ln, Cambridge CB2 1TN, United Kingdom)

University of Cambridge
(The Old Schools, Trinity Ln, Cambridge CB2 1TN, United Kingdom)

University of Cambridge
(The Old Schools, Trinity Ln, Cambridge CB2 1TN, United Kingdom)

Photography

Soumit Roy
(2nd year, 2020-2022)

Waterfall in Shillong

at RKMVERI Campus

at Ward's Lake, Shillong

from my rooftop

at Assam Zoo

at Assam Zoo

at Assam Zoo

at Assam Zoo

Photography

Sujay Mondal
(2nd year, 2020-2022)

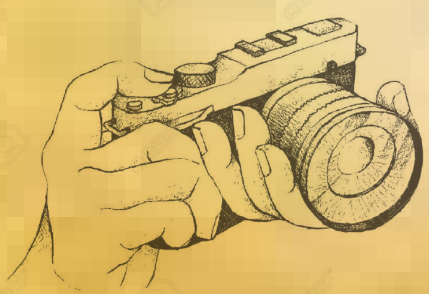

"The sky is the ultimate art gallery just above us.

– Ralph Waldo Emerson

Photography

Krishna Tewary
(2nd year, 2020-2022)

Photography

Mariom Mamtaj
(1st year, 2021-2023)

Photography

Shreya Debnath
(2nd year, 2020-2022)

Photography

Arka Bhattacharyya
(1st year, 2021-2023)

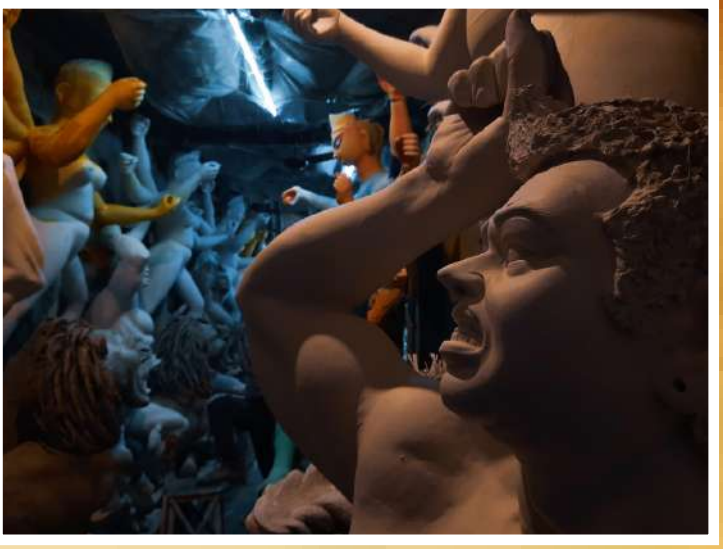

PHOTOGRAPHY

Photography

Beauty of North Bengal

Shreyashi Paul
(2nd year, 2020-2022)

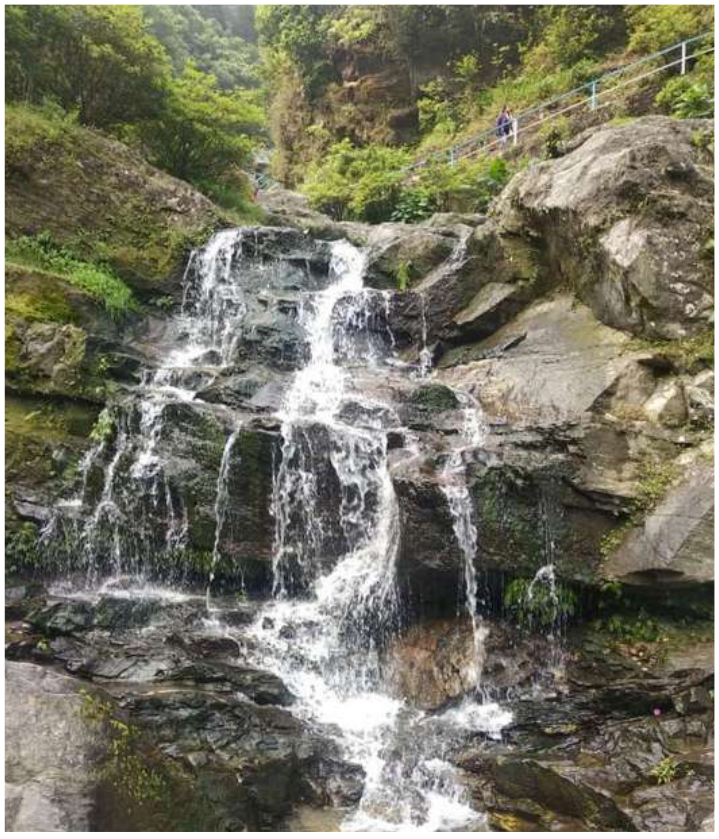

Photography

Himachal: Land of Snow-capped Mountains

Disha Banerjee
(2nd year, 2020-2022)

Chadwick Falls

Birds of Rabindra Sarobor

(A Photography Series)

Rwik Dhramapal Banerjee
(2nd year, 2020-2022)

সরোবরের স্থায়ী বাসিন্দা

Yellow Footed Green Pegion (হলদে পেয়ে হরিয়াল)

Spotted Owl (কুটুরে পেঁচা)

Lineated Barbet (দাগি বসন্ত বৌরি)

Moorhen (জল মুরগি)

Stork Billed Kingfisher (মাছঘোরেল)

Parakeet Couple (ফুলটুসি যুগল)

Migratory Bird (পরিযায়ী পাখি)

Asian Brown
Clicked on: 27.03.21; Place: Rabindra Sarobor

Brown Breasted Flycatcher (খয়েরি বুক চুটকি)
Clicked on: 27.03.21; Place: Rabindra Sarobor

Blue Breasted Flycatcher (নীল বুক চুটকি)
Clicked on: 27.03.21; Place: Rabindra Sarobor

Taiga Flycatcher (তৈগা চুটকি)
Clicked on: 14.01.21; Place: Rabindra Sarobor

Orange Headed Thrush (কমলাফুলি/ দামা পাখি)
Clicked on: 18.01.21; Place: Rabindra Sarobor

Painted Stork (সোনাজঙ্ঘা)
Clicked on: 04.01.21; Place: Rabindra Sarobor

Migratory Bird (পরিযায়ী পাখি)

Verdict Flycatcher (নীল কটকটিয়া)
Clicked on: 01.03.21; Place: Rabindra Sarobor

Ultramarine Flycatcher (সাগরনীল চুটকী)
Clicked on: 25.03.21; Place: Rabindra Sarobor

Hill Mayna (পাহাড়ি ময়না)
Clicked on: 01.03.21; Place: Rabindra Sarobor

Black Browed Reed Warbler
Clicked on: 01.03.21; Place: Rabindra Sarobor

Crossword

(Physics Related)

Disha Banerjee
(2nd year, 2020-2022)

Hint:

Down:

1. Materials that exhibit Radioactivity. A movie on Marie Curie was also released on 2019 having this title.

2. It is a material that produces a magnetic field and can attract iron.

3. A negatively charged ion

6. It denotes the straight line along which light or other form of radiation is propagated from its source.

9. It uses a chain reaction to induce a controlled rate of nuclear fission in fissile material, releasing both energy and free neutrons.

10. It is a machine with moving parts that converts power into motion. (Plural)

13. Greek word for it is indivisible. These are the basic units of matter

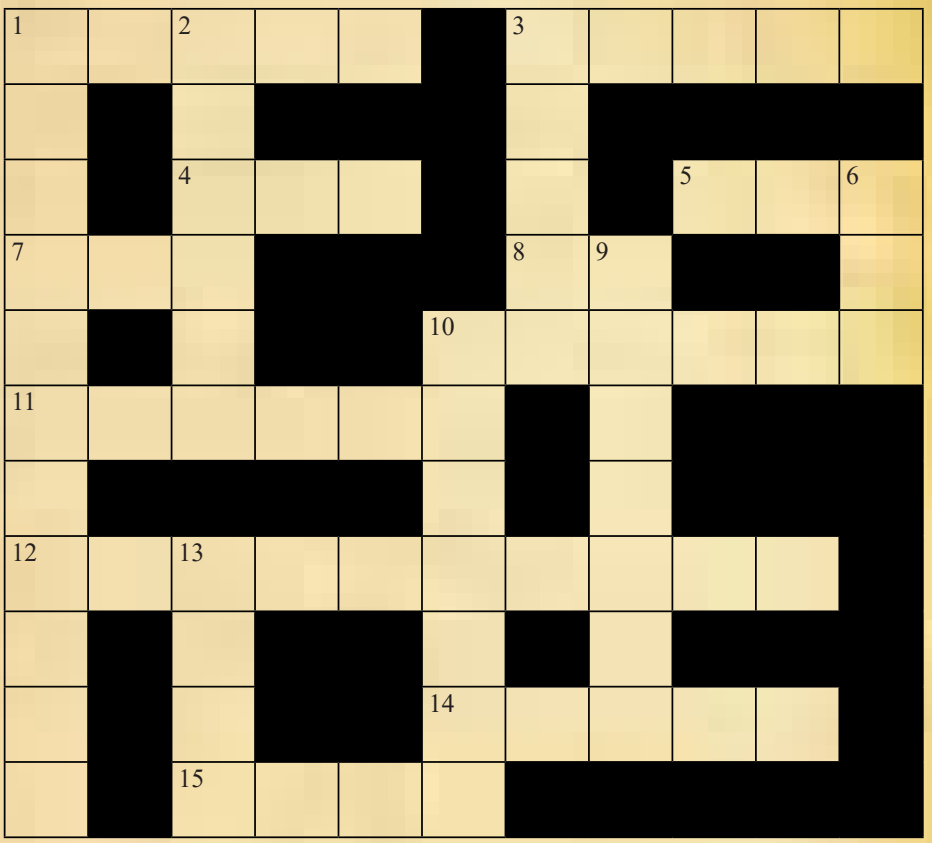

Across:

1. Indian Physicist known for his work in the field of light scattering and recieved Nobel Prize in Physics and was the first Asian to recieve a Nobel prize in any branch of science.

3. It is the electrode from which electrons leave a system. In a battery or other source of direct current the it is the negative terminal.

4. A substance or matter in a state in which it will expand freely to fill the whole of a container, having jno fixed shape and no fixed volume.

5. It is the metric unit of pressure.

7. It is a particle, atom or molecule with a net electrical charge.

8. Digital logic gate that gives output as 1 if any of the input is 1

10. It is the quantitative property that must be transferred to a body or physical system to perform work on the body, or to heat it. It is a conserved quantity

11. It is a numerical value describing how a physical system has changed over time. It takes different values for different paths to determine the path followed by the system, this given quantity must be extremised.

13. It is a semiconductor device used to amplify or switch electronic signals and electrical power. It usually has at least three terminals for connection to an external circuit.

14. It is the difference between the actual value and the calculated value of any physical quantity.

15. It is the fourth planet from the Sun and the second-smallest planet in the Solar System

Word Search

(Physics Related)

Disha Banerjee
(2nd year, 2020-2022)

A	M	P	M	C	O	N	D	U	C	T	O	R	Y
Q	U	R	Z	H	O	P	O	P	T	I	C	S	G
E	O	R	E	L	A	T	I	V	I	T	Y	Z	E
I	N	L	A	D	A	L	P	M	Y	M	U	B	N
N	L	F	K	N	H	M	H	D	F	O	R	C	E
S	O	B	R	O	I	F	P	L	R	A	D	A	R
T	K	P	O	E	M	O	C	E	R	N	O	M	A
E	A	A	V	T	Q	K	M	P	R	M	K	O	T
I	D	S	P	H	H	U	Z	T	P	E	L	M	O
N	N	C	L	E	O	V	E	O	O	H	M	E	R
A	G	A	P	R	O	T	O	N	E	R	K	N	A
N	O	L	E	P	K	I	O	L	C	A	Q	T	N
H	P	A	C	H	A	R	G	E	T	Y	O	U	P
I	M	P	E	D	E	N	C	E	O	H	A	N	E

Down The Memory Lane

RKMVERI holds a special place in our hearts, it is a place that many of us consider our second home. From Classmates to friends, strangers to family, the journey has been one we would love to relive over and over again.

The moments that we spent together and the memories we made keep on living in our hearts. This section is a small effort to help you relive those moments alongside us. We welcome you to walk down memory lane.

We would like to thank our teachers and seniors for their constant support and guidance.

We would like to thank batch 2019-21, for their valuable contribution by sharing the pictures of their respective batch.

RKMVERI (Prajna Bhavan)

Pic Courtesy: Subha Maity (2nd year, 2020-2022)

RKMVERI (Academic Block)

Departmental Freshers ’19
Batch 2019-21

Astronomy Workshop
2nd year students (batch 2019-21)

During Visit of Prof. Mustansir Barma

2nd year Students (Batch 2019-21)

Departmental Picnic ’20

2nd year students (Batch 2019-21) with Prof. Abhijit Bandyopadhyay and Prof. Amitava Bhattacharyya

2nd year students (Batch 2020-22)

Teachers' Day celebration (via Google Meet)

Arranged by 2nd year Students (Batch 2020-22)
Date: 5th September, 2021
Full program link: https://youtu.be/DQpOFF5OVVY

Answers of Crossword

Across:

1. Raman 3. Anode 4. Gas 5. Bar 7. Ion 8. Or 10. Energy
11. Action 13. Transistor 14. Error 15. Mars

Down:

1. Radioactivity 2. Magnet 3. Anion 6. Ray 9. Reactor 10. Engines 13. Atom

Answers of Word Search

Einstein, Muon, Impedence, Pascal, Charge, Proton, Noether, Uranium, Frequency, Relativity, Ampere, Conductor, Optics, Force, Cern, Lepton, Radar, Volt, Ohm, Torque, Momentum, Generator

সমাপ্ত

http://physics.rkmvu.ac.in/ /RKMVERiphysics Dept of Physics RKMVERI